গাওছিয়া লাইব্রেরী
নূরুদ্দীন আহমদ

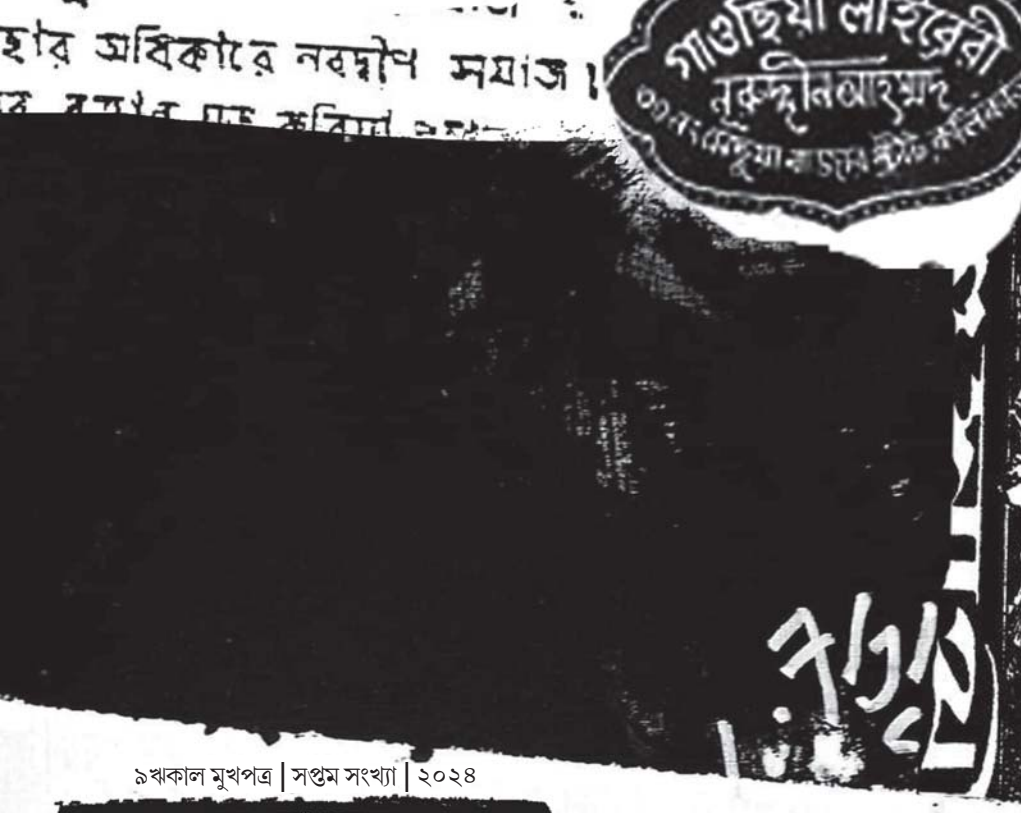

৯ঋকাল মুখপত্র | সপ্তম সংখ্যা | ২০২৪

চমৎকার

বইয়ের দোকান

৯ঋকাল মুখপত্র | সপ্তম সংখ্যা | ২০২৪

চমৎকার

বইয়ের দোকান

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৪, কলকাতা বইমেলা

প্রকাশক
সামরান হুদা
৯ঋকাল বুক্‌স
৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড (দ্বিতল), কলকাতা ৭০০০২৫

সম্পাদকীয় দপ্তর
৯ঋকাল বুক্‌স
১৯/৪/৩ হালদার পাড়া লেন, প্রকৃতি ভট্টাচার্য শিশু উদ্যানের বিপরীতে,
মন্দিরতলা, শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২
ফোন + ৯১ ৯৭৪৮৭৪৭৪৮৭/+ ৯১ ৯০০৭২৭৫২৪৭
ইমেল lyriqal.books@gmail.com
www.lyriqalbooks.com

সম্পাদনা
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা
সৌরদীপ ঘোষ
সায়নী ঘোষ

চিত্র সম্পাদনা ও বিন্যাস
সুমেরু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র

অলংকরণ
ব্যবহৃত ছবিগুলি অর্ক দেব এ আই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ করেছেন

হরফ বিন্যাস
সুচরিতা দাস করণ, ৩৮, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া ৪

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস, ৩১ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৯

দাম ৫০ টাকা

বইয়ের দোকানের ফসফরাস

বইয়ের দোকান নিয়ে আমার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গিরীন্দ্র লাইব্রেরী। যদিও স্মৃতিটা বইয়ের নয়। ক্লাসের পরীক্ষায় একবার ঘড়ির অঙ্ক ঠিক করায় বাবা আমাকে সে-দোকানে নিয়ে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি দেওয়া জ্যামিতি-বাক্স কিনে দিয়েছিল। প্রাইমারি স্কুলে আমার কোনো বন্ধুর নিজস্ব জ্যামিতি-বাক্স ছিল না। ফলে গিরীন্দ্র লাইব্রেরীকে আমি কখনো ভুলিনি। নদীর ধারে যে-শহরে আমি বড়ো হয়েছি তার উত্তরদিকে ফকির ঘাট লেনের গায়েই ছিল গিরীন্দ্র লাইব্রেরী। সেখানে 'ছাত্রবন্ধু' ছাড়া অন্য কোনো বই কিনেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু একটু লায়েক হতেই স্টুডেন্টস কর্নার, বুক কর্নার, মডার্ন বুক সিন্ডিকেট আর স্টুডেন্টস লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা শুরু হল। বুক কর্নারে সত্যিই এক কোনায় পড়ার বইয়ের বাইরের বইপত্তর সাজানো দেখতাম। তুলনায় খাগড়া চৌরাস্তায় স্টুডেন্টস লাইব্রেরির আবহাওয়া আমার জুতসই লাগত। দেড়তলা দোকানে অঢেল গল্পের বই। কিন্তু শীতে শহরের ছোট্ট বইমেলাতেই প্রথম বিভিন্নরকমের বই দেখেছি। নাম জেনেছি পাবলিশারদের। কবিতার বইয়ের নাগাল আমরা সহজে পেতাম না। বইমেলায় পুষিয়ে নিতাম সেসব আক্ষেপ। ততদিনে বড়োদের সঙ্গে ওঠাবসা বাড়ছে। আর তাদের মুখ থেকেই জানছি সাহিত্যের হাল-হকিকত। কোন কবি/লেখককে পড়তেই হবে, কোন বই না-পড়লে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যায় না— এমনকী না-পড়েই মুখে মুখে বাতিল করে দিচ্ছি বেশিরভাগ বই।

তারপর লোটাকম্বল নিয়ে কলকাতায় চলে এসে যে-কলেজে ভরতি হলাম সেটা একেবারে বইপাড়ার মাঝখানে। আমাদের কলেজের ফুটপাথ থেকে বইপাড়ার ধরতাই শুরু। ফলে বইয়ের জন্য আর কখনো ভাবতে হয়নি। ভবানী দত্ত লেনের মুখ থেকে কলুটোলার রাস্তায় ইউনিভার্সিটি পোস্টাফিস পর্যন্ত, পঞ্চাননদা-র বাংলা বইয়ের দোকান থেকে সালাউদ্দিনদা-র ইংরেজি বইয়ের দোকান। আবার রাস্তা পেরিয়ে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট আর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের দিকে পা বাড়াতে চোখে ঝিলমিল লেগে যায়! সেই ঘোর আজও কাটেনি আমার। কলেজে এমনও হয়েছে, ক্লাসে মাস্টারমশাই হয়তো কোনো বইয়ের কথা বললেন, আর আমরা ধূমপানের বিরতি নিতে বাইরে এসে ঠিক সেই বইটা হাতে নিয়ে বিভাগে ফিরে তাক লাগিয়ে দিয়েছি। এর কুফলও আছে— কলকাতার অন্য জায়গার দোকানগুলোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে খানিকটা বেশি বয়সে।

খাপছাড়া এই শিবের গীতটা গাইলাম কারণ, বুঝতেই পারছেন, 'চমৎকার'-এর এবারের বিষয় বইয়ের দোকান। আমরা চেষ্টা করলাম পাঠক, লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, পুস্তক ব্যবসায়ী— বিভিন্ন মানুষের স্মৃতি আর স্বপ্নের হদিশ নিতে। বলাইবাহুল্য, এই সংকলনে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। কেবল বইয়ের দোকান ঘিরে কথাবার্তা শুরুর ইঙ্গিত আছে। 'চমৎকার' এই কাজটাই করতে চায়। নানান ভাবনা উসকে দেওয়াই ৯ঋকালেরও লক্ষ্য। আর বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের মতো মনে করিয়ে দেওয়া— চারপাশে যত বই দেখছেন, সব আসলে বই নয়, কিছু কিছু বই।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

সূচিপত্র

বইঘর পরিক্রমা - শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭
নাকের বদলে নরুন - অজয় গুপ্ত ৯
বই! বই!! বই!!! - তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১৩
আমার বইয়ের দোকান - অরণি বসু ১৬
বইয়ের দোকান - অনির্বাণ রায় ১৮
বই-আপণ - রাজীব চক্রবর্তী ২১
আমার বই চেনা আর বই জানা - শুভঙ্কর দে ২৫
ধারাবাহিক - সুধন্য সরকার ২৯
পাঠকের আশ্রয়-প্রশ্রয় যারা - শিশির রায় ৩২
'আ বাও আ কু'র আফসানা - সায়ন্তন সেন ৩৭
গওসিয়া লাইব্রেরিতে দেড় ঘণ্টা - পৃথ্বী বসু ৪১
বইপাগলের পান্থশালা - অর্ক দেব ৪৩

বইঘর পরিক্রমা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমায় বই কেনার নেশায় পেয়েছিল এম এ পড়ার সময়ে (বিড়ি-সিগারেট-মদ্যাদি কোনো নেশায় আমার আসক্তি হয়নি কোনোদিন— আজীবন নেশা বলতে ওই একমেব)— একটা অপ্রত্যাশিত যোগের সূত্রে। বি এ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্স-এর খাতায় কী এক বাহাদুরির খাতিরে দু-বছরের জন্য একটা সাম্মানিক বৃত্তি পেয়েছিলাম— তিনমাস অন্তর অন্তর নিয়মিত ডাকযোগে সাড়ে তিনশো টাকা করে আসত— সে যুগে সে অনেক টাকা! বাবার কথা ছিল, সরাসরি আমার পাঠক্রম ধরে পড়াশোনায় যেসব বই আমার কেনা দরকার, তা জোগান দেওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণত তাঁর। কিন্তু এই যে আমার অর্জনের উপার্জন, তা আমার ইচ্ছামতো যেকোনো খাতে খরচ করার স্বাধীন অধিকার আমার, তাতে 'প্রয়োজন' মেটাবার চাপ নেই। ওই ত্রৈমাসিক প্রাপ্তির সবটাই আমি খরচ করতে থাকি বই কেনায়। কলেজে আমার সেই মহা-মহীয়ান মাস্টারমশাইদের জ্ঞানালোকে তখন আমার সামনে খুলে যাচ্ছে বিপুলকৌতূহলী বহুবিস্তারী দৃষ্টিসুখ। সাহিত্যের ছাত্র আমি, কিন্তু মাস্টারমশাইদের জ্ঞানপ্রসাদে আর চারিপাশের রাজনৈতিক আবর্তের আবহে বুঝতে পারছি, সাহিত্যকে আস্বাদন করতে হবে ইতিহাস-রাজনীতির অমোঘ ধারার আভাস-প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার তন্তু-সমাহারের সঙ্গে— তারপর সেই সাহিত্যকে অন্তরস্থ করে বোধ ও বুদ্ধিতে তাকে জারিত করে নিজের জীবনযাপনে তাকেই চালিকাশক্তি করে নিতে হবে। সাহিত্যের সঙ্গেই তখন পড়তে হবে কত বিষয়ে কত বই যা জানতে সাহায্য করবে, ভাববার, বিচারের খোরাক জোগাবে। সেই তাগিদেই বই কেনা।

কেনাকাটা শুরু হল কলেজ স্ট্রিটেই, আমার নিজের কলেজ পাড়ায়— মূলত, দাশগুপ্ত, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, রূপা, শরৎ বুক হাউসে— জিজ্ঞাসা-আকুল চাহিদার তাড়নায়। সিগনেট প্রেসে যাই, নিয়মিত তুলে নিই অপূর্ব সেই 'টুকরো কথা'— পরে তারই অন্যতম কারিগর নিরুপম চট্টোপাধ্যায় আমাকে নিয়ে আসেন সম্পাদকীয় পেশায়, তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মক্ষেত্র অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে। মনে আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমী' প্রকাশিত হয়েছে খবর পেয়ে দুই বন্ধু একসঙ্গে ছুটে গিয়ে সিগনেট-এ দু-জনে দু-কপি বই কিনে পরস্পরকে উপহার দিয়েছি।

এম এ পড়তে পড়তেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় কাজ— পার্টির কাজ— করছি। সেখানে তিনটি মূল দায়িত্বের মধ্যে একটি 'রবিবারের পাতা'র সম্পাদক সরোজকুমার দত্তের নির্দেশে-পরামর্শে লেখা তৈরি করে দেওয়া, বা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'-এর কপি বিমান-ডাকযোগে একদিন দেরিতে পঁচিশ পার্ক লেন-এর (পরে তেত্রিশ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের) দফতরে পৌঁছয়, অনেক খবর জানা যায় যা পুঁজিবাদী মালিকানাধীন দেশি-বিদেশি পত্রিকায় চাপা দেওয়া হয়, তাছাড়াও সেই ষাটের দশকে ঘনায়মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ববিসংবাদ, তর্কবিতর্কের আঁচ, মতান্তরের সূত্র। প্রতিদিনের 'ডেলি ওয়ার্কার' ঘোরে দফতরের আগ্রহী সাংবাদিক-কর্মীদের হাতে হাতে, কিন্তু 'রবিবারের পাতা'টা আসবামাত্রই বাড়ি নিয়ে চলে যান সরোজদা, বাড়িতে বসে খুঁটিয়ে তারিয়ে পড়ে খুঁজে বার করেন বামপন্থী সাংস্কৃতিক-মানসনির্মাণে প্রাসঙ্গিক উপাদান। সেই সন্ধানেই তাঁর বিচারে এখানকার চিন্তার নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৯৬০ সালে ইংলন্ডে ডি এইচ লরেন্সের 'লেডি চ্যাটারলিজ় লাভার'-এর পেঙ্গুইন বুকস-এর নব সংস্করণ প্রকাশে ব্রিটিশ সরকার

কর্তৃক তা নিষিদ্ধ ঘোষণা, তার বিরুদ্ধে পেঙ্গুইন বুকস-এর মামলা, ও সেই মামলায় সরকারের হার, প্রকাশকের জয়। লরেন্স-এর উপন্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা বিলোপের এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে নিহিত রাজনীতি, যৌনতার স্বীকৃতির প্রশ্ন, রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপ-এর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে ব্রিটিশ সমালোচক আর্নল্ড কেট্‌ল-এর প্রবন্ধ বেরোয় 'ডেলি ওয়ার্কার'-এ। সেটি 'স্বাধীনতা'র জন্য অনুবাদের দায়িত্ব সরোজদা দিলেন আমাকে। কলেজে অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য যখন আমাদের ডিকেন্স পড়িয়েছেন, তখনই কেট্‌ল-এর সাহিত্যবিচারের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমার বইয়ের সংগ্রহে তারপরই অন্তর্গত হয়ে গেছে দুই খণ্ডে গ্রন্থিত কেট্‌ল-এর ইংরেজি উপন্যাসের ইতিহাস। 'ডেলি ওয়ার্কার'-এ কেট্‌ল-এর প্রবন্ধ অনুবাদ করতে গিয়েই প্রথম আবিষ্কার করি যে, লরেন্স তিন-তিনবার এই উপন্যাস লিখেছেন, এই তিন ভাষ্যের বিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন কেট্‌ল। উপন্যাসের প্রথম ভাষ্যে অভিজাত কর্ত্রীর পশুপোষক-পালক প্রেমিক এই সম্পর্ক ভেঙে চলে গিয়ে কারখানায় কাজ নেন, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ গ্রহণ করেন! আমার অনুবাদে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশের সপ্তাহখানেক পরে দাশগুপ্ত-র দোকানে গেছি অক্সফোর্ডের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের একটি খণ্ড তুলতে। কাউন্টারে বিল কাটা হয়েছে, হঠাৎ লক্ষ করি ধূলিধূসরিত অবজ্ঞায় অবহেলিত একটি তাকে কালজীর্ণ এক কপি 'দ্য ফার্স্ট লেডি চ্যাটারলি'— কলকাতায় কারো চোখে পড়েনি কোনোদিন। আমি তখনই বই কিনে সন্ধেয় পরম শ্লাঘাভরে সরোজদাকে বইটা দেখাই। দু-জনেই উৎফুল্ল হই। এইরকম এক একটা রোমহর্ষক আবিষ্কারের উচ্ছ্বাসেই এক একটা বইঘর আত্মার আত্মীয় হয়ে থেকে যায় বই-নেশাখোরদের।

বই আর বইঘর জড়িয়ে আমার এই দীর্ঘ জীবন-ইতিহাসে জমে আছে অনেক অধ্যায়— পুনের ইন্টারন্যাশনাল বুক ডিপোয়, লখনউ-এর রাম আদভানির দোকানে (প্রবাদপ্রতিম আদভানিজি আমার কেনা বইতে অটোগ্রাফ করে দিয়েছেন— বইয়ের বিদেশিনী, যশস্বিনী, বিদুষী লেখিকা তাঁর ভূমিকায় আদভানিজির কাছে ঋণ স্বীকারে অকুণ্ঠ); লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজ়িয়ম-এর কাছে কোলেট্‌স্-র দোকানে (যেখানে সেই ১৯৮১ সালে আমার প্রথম দু-দিন লন্ডন প্রবাসের প্রথম দিনেই কিনি দারিও ফো-এর নাটক 'ডেথ অফ অ্যান অ্যানার্কিস্ট', পরের দিনই দেখি কাছের থিয়েটারে বেল্‌ট্‌স্ অ্যান্ড ব্রেসেজ় প্রযোজিত তার ঐতিহাসিক প্রযোজনা (সেই প্রথম ইতালির বাইরে অনুবাদে দারিও ফো-এর মঞ্চায়ন); সারাটা দিন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বুকস্টোরে (বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরতা আমার পুরাতন ছাত্রী আমায় সকালে তার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে তার দফতরে চলে যায়, সন্ধ্যায় কর্মান্তে আমার সদ্য কেনা বইয়ের ভারসহ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়); ২০১৪ সালে বের্লিনে ফ়োক্‌স্‌ব্যুয়েনে নাট্যগৃহে (যার প্রতিষ্ঠাতা প্রবাদপ্রতিম এর্‌ভিন পিসকাটর, যেখানে নির্দেশনায় হাতেখড়ি বেরটোল্‌ট্ ব্রেখ্‌ট্-এর) যেদিনই নাটক দেখতে যাই, সেই রোজ়া লুক্সেমবুর্গ প্লাট্‌স্-এর (যার কাছেই ফ্যাসিস্ট গুন্ডারা মিছিল থেকে টেনে বার করে এনে হত্যা করেছিল রোজ়া লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্‌কে, সেই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবহ দুই রাস্তা রোজ়া লুক্সেমবুর্গ স্ট্রাস্‌সে ও কার্ল-লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ স্ট্রাস্‌সে এসে মেলে রোজ়া লুক্সেমবুর্গ প্লাট্‌স্-এ, আমি সেখানে পৌঁছে যাই ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন থেকে সোজা উঠে এসেই) গা থেকেই ঢুকে যাই পাশের গলির ছোট্ট বইঘরে, যেখানে পাওয়া যায় ইংরেজি অনুবাদে জর্মানভাষী ও স্ক্যানডিনেভীয় নানা ভাষায় রচিত বামপন্থী সাহিত্য।

মন খারাপ হয়ে যায়, আমার পুরোনো বালিগঞ্জ পাড়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া জিজ্ঞাসা বা দেশপ্রিয় পার্কের উলটোদিকের দেয়াললগ্ন স্টলটির কথা ভেবে— কত প্রিয় বই কিনেছি সেখানে। বয়সের চাপে, যান-জটিলতায় আর যাওয়া হয় না চৌরঙ্গির ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সিতে— এখনও কি আগের মতোই তরতাজা আছে?

নাকের বদলে নরুন

অজয় গুপ্ত

বইয়ের দোকানে পৌঁছতে এখনও ঢের দেরি! সবে পাঁচ বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসেছি। আপাতত আছি এক কাকার কাছে দমদমে— উদ্বাস্তু কলোনিতে। পড়ি ক্লাস VII-এ— স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে। কাকা ওই স্কুলেই পড়ান।

এখানে আছি বছর পাঁচেক হল। কাজেই বন্ধুবান্ধব জুটেছে কিছু— মিহির, অধীর, শঙ্কর, দুলাল, বাণী। কেন মাথায় এসেছিল জানি না, কথাটা আমিই তুলি, তারপর ওরা সবাই তাতে সায় দিল— একটা দরমায় দেওয়াল পত্রিকা করে রাস্তার ধারে নারকেল গাছে ঝুলিয়ে দেব— মাসে একটা করে। সারাদিন থাকবে— স্কুল থেকে ফিরে, সন্ধের আগে আমি সেটা তুলে ঘরে নিয়ে রাখব। নাম ঠিক হল 'প্রভাতী'।

চাঁদা তুলে দরমা, সাদা কাগজ, রং, তুলি, পেরেক আরও যা যা দরকারি জিনিসপত্র কিনে কাজ শুরু করে দিলাম। সব কাজের ভার আমার ওপরেই পড়ল দুটো কারণে— ১. মতলবটা আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছে, আর ২. দলে আমার হাতের লেখাটাই সবার চেয়ে ভালো। বাণী একটু-আধটু আঁকতে পারত। কবিতা, গল্প— এসবের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় ও একটু আলপনা-টালপনা দিয়ে দেবে।

হঠাৎ বৃষ্টিতে দু-একটা সংখ্যা নষ্ট হলেও কয়েকটা মাস বেশ চলল— রাস্তার লোক— কেউ কেউ— দাঁড়িয়ে বিনা-দেওয়ালের দেওয়াল পত্রিকা পড়তেন। দেখে ভালো লাগত।

কলোনির দাদাদের মধ্যে বিজয়দা, বিনয়দা, দীপ্তিদা, হারাধনদা— এঁরা কেউ কলেজে পড়তেন, কেউ পাশ করে চাকরি করতেন, আবার কেউ চাকরি খুঁজতেন। একদিন হঠাৎ বিজয়দা আমাকে দেখে বললেন, 'তুই হুদামুদা খাইট্যা মরস—' 'এই কথা কও ক্যান?' 'মিহির, অধীর, দুলাইল্লা— অরা তো নিজেরা ল্যাখে না— রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোরের ল্যাখা নকল কইরা দ্যায়। তুই পত্রিকা বন্দ কইরা দে।'

মিহির, অধীর, দুলালকে যখন বিজয়দার অভিযোগের কথা বলি ওরা তো আকাশ থেকে পড়ল— 'এতে নালিশ করনের কী আছে? — হ, আমরা তো নকল কইরা-ই দেই। গল্প কবিতা এইসব মাইনষে নিজের মাথার থিকা বাইর করতে পারে নাকি?! তুই-ও যেমন!'

'প্রভাতী' বন্ধ হল ঠিকই কিন্তু লেখালেখি নিয়ে এই আমবাতটা আমার গেল না। যখন ক্লাস IX-এ পড়ি তখন পরপর তিনদিন টিফিনের সময় একটু একটু করে লিখে একটা গল্প শেষ করে 'শুকতারা' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই। গল্পটা ছাপাও হয়। স্কুল ম্যাগাজিনে শেক্‌স্‌পিয়ারের 'আন্ডার দ্য গ্রিনউড ট্রি' এবং লর্ড টেনিসনের 'দ্য ব্রুক' কবিতার বাংলা ভাষান্তর ও 'জাগরণ' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়।

১৯৫৫ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করে কলোনি থেকে চলে যাই বেলভেডিয়ার-এ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি স্টাফ কোয়ার্টার্সে। আমার এক কাকা জাতীয় গ্রন্থাগারে চাকরি করেন। ওখানে আমার জেঠু, জেঠতুতো দাদা এবং আরও দুই কাকাও থাকেন। ভরতি হই আশুতোষ কলেজে। ওখানে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে থাকতেই কলেজ ম্যাগাজিনে একটি গল্প ছাপা হয়। সেই সূত্রে আলাপ হয় বয়সে কিছু বড়ো এক সহপাঠীর সঙ্গে। যিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে 'মানস' নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় করছেন। তাঁরা নিলেন আমাকে সঙ্গে। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় আশুতোষ কলেজ পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হলাম।

এই যে সব ধানাই-পানাই, ভালো বাংলায়, ধান ভানতে শিবের গীত, তা কিন্তু অকারণ নয়— সবই সেই বইয়ের দোকানে পৌঁছোবার 'পথ-পাথর' (Milestone)। একটু সবুর করুন, দেখতে পাবেন।

পড়াশুনা করিনি বলে এক বছর পরে বি এ পরীক্ষা দিয়েও কম্পার্টমেন্টাল-এ বি এ পাশ করে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে একটু দেরিতে ভরতি হলাম তখন রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ একেবারে দোরগোড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের মুখপত্র 'একতা'র যে 'রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে, তার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নামও ঠিক হয়ে গেছে— কেবল একটি জায়গা খালি রাখা হয়েছে? হ্যাঁ, আমার জন্য। কেন? সম্পাদকমণ্ডলীতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সহপাঠী নৃপেন্দ্র সাহা ('গন্ধর্ব' পত্রিকার সম্পাদক) ছাড়া আর কেউ বই ছাপানো বিষয়ে কিছু জানেন না। কিন্তু 'মানস' পত্রিকার সূত্রে ইতিমধ্যে কিছুটা হলেও ছাপাখানার মজুর হিসেবে আমার নাম 'ফেটেছে'— কাজেই।

ওই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক বিশেষ সংখ্যা 'একতা' করতে গিয়ে সে-বছর আমার আর নৃপেনের পরীক্ষাটাই দেওয়া হল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক একটা কাজ ছিল— যা প্রায় বইয়ের দোকানে পৌঁছে যাওয়ার সামিল। খুলে বলছি।

আমার স্কুলের সহপাঠী পৃথ্বীশ (পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, তখনই সে রীতিমতো খ্যাতনামা কমার্শিয়াল আর্টিস্ট) একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাস শেষ হবার পর আমার কাছে এল। বলল, 'চল, কাছেই এক জায়গায় যাব।' নিয়ে এল বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি রেলিং-এর 'বইয়ের দোকান'-এ। বিশেষ একটি দোকানের সামনে এসে সে দোকানদার সোলেমান-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, 'ছুটির পর এখানে রোজ চলে আসবি। ওরা তোকে কতকগুলো পুরোনো বই দেবে। কালির দোয়াত, তুলি দেবে। তুই বইগুলোতে সুন্দর করে নাম লিখে দিবি।' তারপর ফিরতি পথে বলল, 'পয়সা নিবি না। যখন বই কিনবি ওরা তোকে বইয়ের দাম কমিয়ে দেবে। রেয়ার বই পেলে তোর জন্য রেখে দেবে।'

কাঠির ডগায় সুতো দিয়ে অল্প একটু তুলো বাঁধা তুলি আর চাইনিজ ইঙ্কের একটা দোয়াত। বহুদিন ছুটির পরে ওই দোকানে এসে একখানা ইটের ওপর বসে অনেক বইয়ের নাম লিখে দিয়েছি। ওইসব দিনের থ্রিল এতদিন পরে লিখে কিছুই বোঝানো যাবে না। মোবাইলে-মজা বর্তমান প্রজন্ম তা অনুভবই করতে পারবে না।

রেলিং পর্যন্ত পৌঁছেছি যখন, দোকানেও পৌঁছোতে পারব। পারব তো?!

গত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি একটা চাকরি পেলাম। চাকরি কখনো ভালো হয় না। তবে মাইনেপত্র ভালো। সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অফিস। শনিবার ছুটি।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ততদিনে আমি মোটামুটি জমিয়ে বসেছি। কম দিন তো হল না। সেই ১৯৫৫ সাল থেকে। 'মানস' অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে। ইত্যবসরে বইয়ের মলাট আঁকা, প্রুফ দেখা, একটু-আধটু সম্পাদনা করা— মানে বই তৈরির সুলুক-সন্ধান বেশ কিছুটা জানা হয়ে গেছে। মধ্যবিত্তের আসল মৃত্যুবান কোথায় ওঁত পেতে আছে জানেন? সে যা-কিছুই করতে যাক, তার পেছনে অভিনবত্ব-ভালোবাসা-যত্ন-একাগ্রতা— যতই যা থাক— শেষ পর্যন্ত তা আষ্টেপৃষ্ঠে লুটিয়ে পড়ে থাকে অর্থচিন্তার পদতলে। কোথায় যেন একটা পরাজয়ের কালিমা লেগে থাকে।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটেও এত বছরে চেনা-পরিচয়ের গোষ্ঠী বেশ স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। সবার আগে নাম করতে হয় প্রয়াত বন্ধু সুবীর ভট্টাচার্যের। সুবীর সরকারি চাকুরে। কিন্তু ও অফিস করত না। ওর নালিশ— 'আমার কাজের টেবিল নেই, চেয়ার নেই'— তাই ও হাজিরার খাতায় সই করে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন বইপাড়ায় থেকে বইপত্রের কাজের মধ্যেই ডুবে থাকে। প্রচুর মানুষের সঙ্গে

যোগাযোগ। একদিন বলল, 'আপনি একটা প্রকাশন সংস্থা খুলুন— বইপত্রের সন্ধান আমি দেব। আপনাকে সব রকমের সাহায্য করব।'

মনে মনে আমারও ইচ্ছে ছিল— সুবীরের উৎসাহে এবার সেটার বাস্তব রূপ দেবার পালা। আমার মেজদা (আসলে আমার দাদা। কিন্তু আমাদের যৌথ পরিবারে জেঠতুতো দাদাকে 'দাদা' বলেই ডাকি; তাই নিজের দাদা মেজদা।) দীর্ঘদিন বেকার বসে আছে। ওকে বলতে ও রাজি হল। সুবীরের চেষ্টায় ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোডে— 'সুবর্ণরেখা'র ওপরে একটা ঘর পাওয়া গেল। ১৯৭৭ সালে 'অয়ন' (নামটাও সুবীরের দেওয়া) নামে একটি প্রকাশনালয় খোলা হল। মালিকানা আমার মেজদা অমল গুপ্তর। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বই বেরিয়ে গেল : সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'জগদীশ গুপ্তর গল্প', বিনয় ঘোষের 'অটোমেটিক জীবন' এবং 'মেহনত ও প্রতিভা।' গোপাল হালদারের 'সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য'। অংশু মিত্র ছদ্মনামে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প', অভিজিৎ সেনগুপ্তর 'সুন্দরবনের ডায়েরি', প্রদ্যোৎ গুহর 'কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর', অমল দাশগুপ্তের 'আইনস্টাইন : আলোর দিশারী'।

তখন পশ্চিমবঙ্গ পুস্তকব্যবসায়ী সমিতির ব্যানারে বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীত দিকের মাঠে বইমেলা হত। আলাদা স্টল নিয়ে মেলায় আসার ক্ষমতা ছিল না। ৭৩ নম্বর বাড়ির অন্য কোনো প্রকাশকের সঙ্গে একযোগে মেলায় বই বিক্রি করতাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার মতো অবস্থাও ছিল না। বিভিন্ন জেলায় বইমেলা হত। বই নিয়ে মেজদা সেখানে যেত। মেলা দূরেও হত। যেমন ওড়িশার কোনো জায়গায় বা ত্রিপুরায়। ততদিন কলেজ স্ট্রিটে ওরও বন্ধুমহল গড়ে উঠেছিল। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমারও পরিচয় ছিল। তাই মেজদার বাইরে যাওয়া নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না।

কিন্তু দুশ্চিন্তার মেঘটা এল অন্য দিক থেকে। ওড়িশার মেলা থেকে বেশ হাসিখুশি মুডে মেজদা এল : 'মোটামুটি ভালোই বিক্রিবাটা হয়েছে।' হিসেবপত্র করে দেখাল। না, সেখানে কোনো গোলমাল নেই। 'তাহলে টাকা দে— বাজারের ধার মেটাতে হবে তো।' 'টাকা দেব কোথা থেকে? টাকা তো খরচ হয়ে গেছে— এইসব কিনলাম না।' বলে একটা গাঁটরি খুলল। তা থেকে বেরোল কটকী শাড়ি, সম্বলপুরী লুঙ্গি ও গামছা। 'আমাদের কত আত্মীয়-স্বজন— সবাই জানে আমি ওড়িশা গেছি। খালি হাতে আসা যায়! এসব পেলে তারা কত খুশি হবে!'

এই একই যুক্তিতে ত্রিপুরা মেলা থেকে এসেছিল দৃষ্টিনন্দন বাঁশের হস্তশিল্প। (বাঁশ শব্দটি পাঠক লক্ষ না করলে বেঁচে যাই।)।

এর পরেও আমাদের বেশকিছু আত্মীয়-স্বজন ছিলেন যাঁরা তখনও কোনো উপহার পাননি।

পাঠকদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ— তাঁরা যেন ভেবে না বসেন যে, 'অয়ন'-এর গণেশ উলটোবার জন্য বা আমাকে '...' দেবার জন্য মেজদা এমনটা করত। তা নয়। ওকে যারা চিনত তারা সবাই একবাক্যে বলত : 'অমলের সাদা মনে কাদা নেই' আমিও তাই বলি। কেউ কেউ বালক বয়সেই চিরজীবন আটকে থাকে। ও যখন মারা যায় তখন ও ৮২ বছরের বালক। ভুলটা আমার— ওকে ওই কাজে নিয়োগ করা।

তবে মেজদা নয়, 'অয়ন'-এর কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতল অন্য একটা ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামপন্থী শাসকদলের এক ডাকসাইটে বুদ্ধিজীবী মন্ত্রীর একটি প্রবন্ধের বই 'অয়ন' থেকে প্রকাশ করেছিলাম। বেশ দ্রুতই বইটির প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের জন্য অনেক প্রকাশকই তাঁর কাছে দরবার করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের জানান, বইটি তিনি আমাদেরই দেবেন। প্রথম মুদ্রণ

বাবদ তাঁর পাওনা টাকা-পয়সা মিটিয়ে দেবার পর দ্বিতীয় মুদ্রণের জন্য নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। বই ছাপা হয়ে বেরোল। স্বাভাবিক কারণেই প্রথম মুদ্রণের তুলনায় দ্বিতীয় মুদ্রণের চলন অপেক্ষাকৃত শ্লথ হবে। মাস ছয়েক বাদে মেজদা বলল "...বইটা তো 'অমুক' প্রকাশকও বিক্রি করছে।" মন্ত্রীমশাইয়ের অনুরাগীদের অনেককেই আমি চিনি। তাঁদের কাছে জানতে চাইলাম কী ব্যাপার? তাঁরা বললেন, 'এক্ষুনি কোনো কিছু কোরো না— আগে দেখি কী ব্যাপার।'

তাঁরা জেনে এসে যা জানালেন তা এই : তিনি একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী। কত মানুষ তাঁর কাছে আসে অথচ (আমার নাম করে) 'ও' একদিনও আসে না, দেখা করে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাগুলি এত খাপছাড়া বালখিল্যতায় ভরা যে তার কোনো জবাব হয় না।

একটা দু-নম্বরী লোকের খামখেয়ালিপনার জন্য নিরপরাধ আরেকজন সম-ব্যবসায়ীর সঙ্গে লড়তে যাব কেন? সের দরে ফর্মা বেচলে কিছু তো পয়সা পাওয়া যাবে।

'অয়ন' উঠে গেল।

'অয়ন'-এর মাত্র ক-খানা বই। সাধ ছিল, বাছাই করা কিছু বই নানা প্রকাশকের কাছ থেকে এনে সাজিয়ে রাখব। অবশ্য সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে ক-জন বই কিনতে চাইবেন তা নিয়ে সংশয় ছিলই। কিন্তু সাধ তো থাকতেই পারে, বলুন?

বইয়ের দোকান হল না। তবে দোকান একটা হয়েছিল আমার। 'অয়ন' উঠে যাবার দশ-এগারো বছর পরে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে যখন আমার চাকরিটা চলে গেল তখন ডায়মন্ডহারবার লাইনে মগরাহাট স্টেশনে মাস্তানদের ধরে জবরদখল জমিতে পুরোনো সহকর্মীর সঙ্গে একসঙ্গে 'বিজি সাইকেল মার্ট' নামে একটা সাইকেলের দোকান দিয়েছিলাম (বি=বক্‌সি, জি=গুপ্ত)।

বইয়ের বদলে সাইকেল?

তা ওরকম হয় মাঝে-সাঝে। 'নাকের বদলে নরুন' কথাটা শোনেননি? এই থেকেই তো সেই প্রবচনটা এল। উপোস, পুজো এসব ঠিকঠাক না হলে, অনেক সময় মা লক্ষ্মী নিজে না গিয়ে প্যাঁচাকে আর গণেশ তাঁর ইঁদুরকে পাঠিয়ে দেন। পথে প্যাঁচা ইঁদুরটি ধরে খেয়ে নেয়, আর গণেশ নতুন আরেকটি ইঁদুর ধরে পায়ের কাছে রেখে দেন। ভক্ত পুজো আর উপোস চালিয়ে যেতে থাকে।

এমন কত ঘটনাই না ঘটে— সব খবর কি আমরা পাই?

বই! বই!! বই!!!

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

'still doth the old instinct bring back the old names'— Coleridge

পাঠ্যপুস্তকের সূত্রেই বইয়ের দোকানের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। গল্পের বই অবশ্য আকর্ষণ করেছিল পড়তে শেখার আগেই। সেই আকর্ষণেই বোধহয় বই পড়তে শিখি, আরও অনেকের মতোই। তার আগে কেবল দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলা লেখাগুলো পড়তে পারতাম। বিধান সরণি (তখন নাম ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রিট) আর হরিপদ দত্ত লেনের মোড়ে ছিল চারু সাহিত্য কুটীর। আমি জানতাম, ওখানে বিমল দত্ত আর বিকাশ দত্তর লেখা বই পাওয়া যায়, যার মধ্যে কয়েকটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন আমার ছোটো কাকা। তবে নিজে সেই দোকানে ঢুকে কখনো বই কিনিনি।

এখন বিধান সরণিতে বইয়ের দোকান কমে গেছে। কিন্তু সত্তর বছর আগে ওটাকে প্রায় বলা যেত কলেজ স্ট্রিটের উত্তর-প্রসার। ঠনঠনের কাছে ছিল বুকল্যান্ড, যাদের সরকারি ঠিকানা শঙ্কর ঘোষ লেন হলেও শো-রুম ছিল বিধান সরণির ওপরে, শঙ্কর ঘোষ লেনের ঠিক উলটোদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিক ধরেই আরও উত্তরে এগোলে ব্রাহ্ম সমাজের পাশে যে বইয়ের দোকানগুলো এখনও আছে, তখন ছিল না। শ্রীমানি বাজারের দু-তলার বইয়ের দোকানগুলোর সবকটা তখন হয়নি। কিন্তু শ্রীমানি মার্কেট পেরিয়ে তিনটে বড়ো বড়ো বইয়ের দোকান ছিল যার মধ্যে কেবল শ্রীগুরু লাইব্রেরির কথা মনে আছে। তখনকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের বই তাঁরা রাখতেন। বিজ্ঞাপনে দেখতাম। তার উলটোদিকে অর্থাৎ কৈলাস বোস স্ট্রিট আর বিধান সরণির মোড়ে একটা ধুলোমাখা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল ইউ রায় অ্যান্ড সন্স। কষ্ট করে পড়তে হত। কখনো দোকানটা খোলা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জানতাম না যে একটা ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে। একদিন দেখি, সেখানে একটা কাপড়ের দোকান হয়েছে। পশ্চিম ফুটপাথ ধরে বিবেকানন্দ রোডের দিকে এগোলে গোলাপি রঙের একটা বড়ো বাড়ি, যার একতলা জুড়ে প্রকাণ্ড বইয়ের দোকান গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্স। সেও এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান যার উল্লেখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের অনেক চিঠিপত্রে। আমাদের ছোটোবেলায় তাদের ভগ্নদশা। কোনোরকমে চলছিল শরৎচন্দ্রের অনেকগুলো উপন্যাসের ওপর নির্ভর করে, যখন শরৎচন্দ্রের বই অন্যরাও ছাপতে লাগলেন, তখন আর গুরুদাস রইল না। তার একটা বাড়ি পরে নৃত্যলাল শীল'স লাইব্রেরি। ততদিনে তারা আর প্রকাশক নয়, কেবল পুস্তকবিক্রেতা। কিন্তু বটতলার আদি দোকান থেকে শুরু করে বিধান সরণির এই দোকান পর্যন্ত ইতিহাসটা ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন। সেই দিক দিয়ে দেখলে নৃত্যলাল কলকাতার প্রাচীনতম পুস্তক-প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হবার দাবি রাখে। 'রামায়ণ'-'মহাভারত' থেকে স্কুলপাঠ্য বই সবই এখানে পাওয়া যেত। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালায় কৃত্তিবাস চরিত্রের মুখে শোনা যায়— 'নাম আমার কিত্তিবাস/ বটতলায় নিত্যি বাস/নৃত্যলাল শীলের দোকানে।'

বিধান সরণি আর রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের মোড়ে ছিল বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, যার গোলাকৃতি একতলার দরজাগুলোর পাশে টিনের বোর্ডগুলোয় বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা থাকত 'বই!' 'বই!!' 'বই!!!' আমি ছোটোবেলায় ভাবতাম, প্রতিটি বিস্ময়সূচক চিহ্নের সঙ্গে 'বই' শব্দের উচ্চারণও কি পালটাবে? বইয়ের দোকান, নাম বৈকুণ্ঠ; জানি না, শিবরাম চক্রবর্তী এ-নিয়ে কোনো মন্তব্য করেছিলেন কি না তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। এই দোকান থেকে টেস্ট পেপার সংগ্রহ করতাম আমরা।

হেদোর মোড় পেরিয়ে গেলে এই রাস্তার দু-ধারেই ছিল অনেক পাঠ্যপুস্তকের দোকান। কারণ, কাছাকাছি অনেকগুলো স্কুল-কলেজ-ছাত্রাবাস। এইসব দোকানেই নিজে নিজে বই কেনার আরম্ভ। অনেকেই নোটবই ছাড়া পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করতে চাইতেন না। আমার পণ ছিল, কিছুতেই নোটবই কিনব না। ডান্‌ডাস হোস্টেলের পাশেই ছিল প্রফুল্ল লাইব্রেরি। দুই সদাশয় ভাই দোকান চালাতেন এবং নোটবই ছাড়াই পাঠ্যপুস্তক দিতে রাজি ছিলেন। সত্যিই তাঁরা পরস্পরের ভাই কি না জানি না। চেহারা হুবহু এক নয়, তবে দু-জনেরই গাল ছিল আপেলের মতো লাল। যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি, তখন একবার বই কিনতে গেছি। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'তোমাকে ন্যাড়া দেখছি কেন? তোমার কি পৈতে হয়েছে?' উপনয়ন উপলক্ষ্যেই মস্তকমুণ্ডন শুনে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'বুঝি যে তোমাদের পৈতে হবারই বয়স, তবে ন্যাড়া মাথা দেখলে ভয় করে।' তাঁদের স্নেহ ছিল অকৃত্রিম।

স্টার থিয়েটারের উলটোদিকে একটা ছোট্ট বইয়ের দোকান ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ত না অনেক জামাকাপড় আর জুতোর দোকানের মধ্যে। অবাক করত তার সাইনবোর্ড, কারণ তাতে দুটো নাম লেখা থাকত। আর কোনো দোকানের যুগপৎ দুটো নাম দেখিনি। ওপরে লেখা ছিল চট্টো কেতাব কুঠি। তার তলায় অপেক্ষাকৃত বড়ো হরফে লেখা ছিল চলতি নাটক-নভেল এজেন্সি। দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদ, জলধর চট্টোপাধ্যায় অথবা বিধায়ক ভট্টাচার্য, মন্মথ রায় অথবা শচীন সেনগুপ্ত, সকলের নাটকই পাওয়া যেত সেখানে। অতএব ক্লাব বা অফিস বা কলেজ, যাঁরাই নাট্যাভিনয় করতে ব্রতী, সকলেরই অবলম্বন ছিল ওই দোকান। ওটা থিয়েটারপাড়া ছিল, কাজেই নাট্যপিপাসু লোকের আনাগোনার কমতি ছিল না। দোকানটা পঞ্চাশের দশকেই লুপ্ত হয়। পরে কলেজ স্ট্রিটের নব গ্রন্থ কুটির এই অভাব পূরণ করত বহুকাল।

বইয়ের স্টলও তখন হতে আরম্ভ করেছে একটা-দুটো করে। প্রথমে এই স্টলগুলো কেবল দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রাখত। পরে তারা সিনেমা-থিয়েটার সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা রাখতে শুরু করে। তার আগে এই বিক্রেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ম্যাগাজিন সরবরাহ করতেন : 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া', 'রূপমঞ্চ' বা 'শুকতারা', 'শিশুসাথী' ইত্যাদি। বিশেষভাবে মনে আছে হেদোর মোড়ে বসন্ত কেবিনের দরজা ঘেঁষে ছোট্ট বইয়ের দোকানটি, কারণ সেখানে ম্যাগাজিন ছাড়াও কিছু কবিতার বই বিক্রি হত।

কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার কথা বলতে আরম্ভ করলে ফুরোয় না। বিশেষ করে প্রেসিডেন্সির রেলিং ধরে যেসব পুরোনো বইয়ের বিস্তার, সেখানে কেনা ছাড়াও শুধু দেখার বা চাখার অভিজ্ঞতা থেকে কত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা সম্পূরক পেয়েছে, তা সহজে বোঝানো শক্ত। দেশ-বিদেশের অনেক লেখকের নাম সেখানেই প্রথমে জানতে পারি। খুব পরিচিত লেখকেরও অপরিচিত বা বিস্মৃত বইয়ের সন্ধান ওই দোকানগুলি থেকেই পেয়েছিলাম। অনেক দোকানদারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও হয়ে গিয়েছিল। কষ্টেই দোকান চালাতেন তাঁরা। নিয়মিত ঘুষ না দিয়ে সরকারি বাড়ির অংশবিশেষ ব্যবহার করার উপায় ছিল না। কোনো ছাউনি ছিল না তখন; দড়ি দিয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে বাঁধা থাকত সারিবদ্ধ বই, সব মলাট ক্রেতার দিকে ফেরানো, বই চিনতে অসুবিধা হত না। বিক্রেতাদের মুখগুলো মনে পড়ে। সকলের নাম মনে নেই। নিসারুল আর জাফরের সঙ্গে আলাপ হত মাঝে মাঝে। ১৯৬৪-এর জানুয়ারি মাসের দাঙ্গার পর থেকে তাদের ব্যাবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা কয়েকজন বন্ধু, (সকলেই ছাত্র বা বেকার) সামান্য সাহায্য করতে পেরেছিলাম। উলটোদিকের ফুটপাথে অর্থাৎ চক্রবর্তী-চ্যাটার্জির দোকানের সামনে ইট দিয়ে ঘেরা বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসত যোগিন্দার; তার কথাও মনে পড়ে।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় দাশগুপ্ত বা রূপা বা চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তকালয়গুলির কথা অনেকেই জানেন বা লিখবেন। সিগনেট প্রেসের অবদান ও বাংলা কবিতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অপেক্ষা করছি ওই প্রতিষ্ঠানের সংগঠক দিলীপকুমার গুপ্তর (ডি কে) একটি জীবনীর জন্য। কেউ কি লিখেছেন বা লিখবেন?

বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের যে অংশ গোলদিঘির পূর্ব দিকে, সেখানে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পাশে, পানের দোকানের ধার ঘেঁষে একটি চওড়া দরজা আছে। এটি একটি দোকানের নয়, বেশ কয়েকটি দোকানের প্রবেশপথ। ওই পথে ঢুকে ডাইনে বেঁকলে অনেকদিন আগে পাওয়া যেত অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ছোটোদের জন্য প্রচুর বই প্রকাশ করতেন তাঁরা। চালাতেন অমিয় চক্রবর্তী নামে এক অমায়িক ব্যক্তি (কেউ যেন কবি অমিয় চক্রবর্তী সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন)। মাঝেমধ্যে লেখকরা এসে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতেন এখানে। উনিশশো ষাটের দশকের কথা এইসব। একবার কথা হচ্ছিল শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে প্লটের পুনরাবৃত্তি নিয়ে। অমিয়বাবু বললেন, "শিব্রামকে বলেছি, তাঁর একশোটা গল্পের একটা সংকলন আমরা বার করব; বইটার নাম হবে 'এঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যধামে'।" পরে আমার সাক্ষাতে এক বন্ধু শিবরামের কাছে এই পরিকল্পনার কথা বলতেই শিবরাম ধরতে পারলেন। বললেন, 'বুঝেছি অভ্যুদয়, অভ্যুদয়ের কাণ্ড এসব।'

অনেক দোকানই অবলুপ্ত। অবশ্য নতুন দোকানও তৈরি হয়েছে অনেক, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়। দক্ষিণ কলকাতায় অবশ্য তা হয়নি। গড়িয়াহাট বা রাসবিহারীর মোড়ের আশেপাশে যত দোকান বই বেচত পঞ্চাশ বছর আগে, আজ তার সিকিও নেই।

আমার বইয়ের দোকান

অরণি বসু

বইয়ের দোকানের কথা উঠলেই আমার মনে পড়ে সেই ছেলেটার কথা যে অক্ষরজ্ঞান হওয়ার আগেই বাড়ির চাতালে বাড়িরই সব বই সাজিয়ে বসে থাকত সারাদিনমান আর অপেক্ষা করত গ্রাহকের। গ্রাহক তো আসত না, বেলা পড়লে সে আবার গুছিয়ে রাখত তার সামগ্রী পরের দিন ঠিক সময়ে বসার জন্যে। এই ছিল তার খেলা। এইভাবে খেলতে খেলতেই অক্ষরজ্ঞান নয় সে শিখে গিয়েছিল ছবি দেখা। এই ছেলেই যে পরবর্তীকালে লিখে ফেলবে 'অক্ষয় মালবেরি' তাতে আর আশ্চর্য কি! মণীন্দ্র গুপ্তর বাল্যস্মৃতিতে ধরা আছে এই অভিনব বইয়ের দোকানের কথা।

আবাল্য বইয়ের দোকান আমাকে চুম্বকের মতো টানে। ছেলেবেলায় আমাদের শিবপুরে তিনটি বইয়ের দোকান ছিল, তিনটেই বেশ বড়ো। সরস্বতী লাইব্রেরি, বীণাপাণি লাইব্রেরি আর প্রবোধ লাইব্রেরি। প্রথম দুটির সঙ্গে সেরকম সখ্য না থাকলেও প্রবোধ লাইব্রেরিতে আমি যেকোনো ছুতোয় চলে যেতাম। প্রবোধ লাইব্রেরির মালিক প্রবোধ ভৌমিক আমার স্কুল ও পাড়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমল ভৌমিকের কাকা। অমলরা আবার থাকত আমাদের পাশের বাড়িতে। আমি জুলজুল করে পরম মমতায় দেখতুম কাচের আড়ালে রাখা নতুন বইদের। চাইলে কাকু হাতে নিয়েও দেখতে দিতেন। আরও একটু সাহস বাড়িয়ে কাকুকে জানিয়ে, দোকান প্রায় বন্ধের সময়, পরের দিন সকালেই ফেরত দেব এই শর্তে, বাড়িতেও কয়েকবার বই নিয়ে এসেছি।

তখন দশম শ্রেণি, বি কে পাল অ্যাভেনিউতে মামার বাড়ি যাওয়ার অন্যতম আকর্ষণ ছিল শোভাবাজার বাজারের কাছেই এক বয়স্ক ভদ্রলোকের ছোটো পত্র-পত্রিকার দোকান। তাকে দোকান বলা হয়তো সংগত হবে না, কেননা তিনি পসরা সাজিয়ে বসতেন একটি বাড়ির খোলা রকের ওপর। সেখানেই আমি প্রথম একটি পত্রিকার সন্ধান পাই যার নাম 'কবিতা সাপ্তাহিকী', সম্পাদক শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দাম পঁচিশ পয়সা। ওই পত্রিকার মাধ্যমেই সমসাময়িক বাংলা কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওই পত্রিকায় পড়া শামশের আনোয়ার ও সুধেন্দু মল্লিকের দুটি কবিতা আমার মাথায় স্থায়ী বাসা বেঁধে নিয়েছিল। এছাড়া ছিল হাওড়া স্টেশনের খোলা চত্বর। সাবওয়ে তৈরি করার সময় থেকে চিত্রটি আমূল পালটে যাওয়ার আগে হাওড়া স্টেশনে ছিল বইয়ের বেশ কিছু অস্থায়ী দোকান। সেখানে পাওয়া যেত নানান ছোটো ছোটো পত্রিকাও। উবু হয়ে বসে সেইসব পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে যে কী ভালো লাগত! দোকানি না-তাড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত দেখতেই থাকতাম। এইভাবেই আমি ১৯৬৮ সালে শম্ভু রক্ষিতের 'ব্লুজ' কাগজের সন্ধান পাই।

কলেজে ভরতি হওয়ার সময় আমি সিটি কলেজে পড়ার জেদ ধরেছিলাম এইকারণে যে রোজ কলেজ স্ট্রিট আসা যাবে। আমাদের কলেজের ছেলেরা মূলত আমহার্স্ট স্ট্রিটে নামত কিন্তু আমি পাতিরামের দোকানে ঢুঁ মারব বলে কলেজ স্ট্রিটে নেমে পাতিরামে পত্র- পত্রিকার পাতা উলটে একটু বেশি হেঁটে কলেজে যেতাম। আর বেশিরভাগ দিনই একবার চক্কর কাটতাম কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলিতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে যেত উলের বলের মতো অনায়াসে। পরে এই সূত্র ধরেই পৌঁছে গেছি হাইকোর্টের কাছে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের, ডালহৌসি পাড়ার টেলিফোন ভবন বরাবর পুরোনো বইয়ের দোকানে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে। ওখানে আবার বইয়ের সঙ্গে পুরোনো রেকর্ডও পাওয়া যেত। যখন যে-শহরে গেছি আমার চোখ খুঁজে বেড়িয়েছে বইয়ের দোকান।

মুম্বইয়ের ভিক্টোরিয়া স্টেশনের কাছে ফুটপাথ জুড়ে বসা পুরোনো-নতুন বইয়ের দোকানিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবিষ্কার করেছিলাম তারা অনেকেই কোন্নগরের লোক। নিউ দিল্লির দরিয়াগঞ্জের রোববারের দীর্ঘ বইয়ের পসরা দেখে প্রথমবার নিজেকেই বলেছিলাম, 'পাগলা খাবি কি, ঝাঁজেই মরে যাবি'। কলেজ স্ট্রিটের প্রথম সাজানো বইয়ের দোকান যা আমাকে টানে তার নাম সিগনেট বুক শপ। কে যেন বলেছিল ওখানে পুরোনো 'কৃত্তিবাস' কিনতে পাওয়া যায়। কলেজে ঢুকেই একদিন হানা দিলাম। ঝকঝকে চেহারার বিকাশ বাগচী নামিয়ে দিলেন বেশ কিছু পুরোনো 'কৃত্তিবাস'-এর সংখ্যা। কোনোটা আট আনা, কোনোটা বারো আনা, কোনোটা দেড় টাকা। সব মিলিয়ে দাম দাঁড়াল পাঁচ টাকা। আমার পকেটে তখন আড়াই টাকা। আট আনা রেখে দু-টাকা বিকাশবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা জমা রাখুন কাল বাকি টাকা দিয়ে বই নিয়ে যাব'। পান চিবোতে চিবোতে একটু হেসে বিকাশবাবু বললেন, 'একদিন কেন এক সপ্তাহেও কেউ নিতে আসবে না। কিছু জমা রাখতে হবে না, সময়মতো এসে দিয়ে যেও'। সেই বিকাশবাবুর সঙ্গে পরিচয়। তারপর নিয়মিত যেতাম। প্রায় প্রতি সপ্তাহে শো-কেসে নতুন নতুন বইয়ের সম্ভার পালটে পালটে রাখা হত। বড়োসড়ো দোকান মনীষা-তেও গেছি কয়েকবার। এখন ইতিহাস হয়ে যাওয়া কমলালয় স্টোর্স-এ বই পাওয়া যেত। ওখান থেকে সংগ্রহ করেছিলাম দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। দার্জিলিং-এর ম্যালের অক্সফোর্ড বুক শপ খুব টেনেছিল। আর নিউ এমপায়ার, লাইট হাউসের উলটোদিকের দোকান, গ্র্যান্ডের নীচের বিখ্যাত ফরেন বুক শপ-এও হানা দিয়েছি অনেকবার। কেনার সামর্থ্য বিশেষ ছিল না। কিন্তু যেকোনো বইয়ের দোকানের সান্নিধ্য পরম আত্মীয়ের মতো আমায় জড়িয়ে নেয়। ঢাকা যাবার সময় ঠিকই করে গিয়েছিলাম বাংলা বাজারের বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারব। গিয়েছিলাম। কিনেছিলাম 'চিলেকোঠার সেপাই'। চট্টগ্রাম যাওয়া হয়নি আমার। বন্ধু কৃষ্ণা গিয়েছিল। ওখানকার বাতিঘর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল, 'এখানে এসে তোকে খুব মিস করছি। এত বড়ো বইয়ের দোকান। তুই এলে আরও পাগল হয়ে যেতিস'।

কত বিখ্যাত বইয়ের দোকানে যাওয়াই হল না জীবনে। অবশ্য অখ্যাত বইয়ের দোকানের টানও কিছু কম নয়। শিবপুরের বীণাপাণি লাইব্রেরি, প্রবোধ লাইব্রেরি উঠে গেছে কবেই, সরস্বতী লাইব্রেরি টিকে আছে এখনও। নতুন হয়েছে শিখা বুক হাউস। বড়ো দোকান; অনেক নতুন বই আনে। সেখানে মাঝে মাঝে বসি। ভাবি আমি যেমন বইয়ের দোকান খুঁজি, বইয়ের দোকানও নিশ্চয়ই আমাদের মতো পাগলদের সঙ্গে দেখা হলে খুশি হয়। দোকানদাররা অবশ্য এইসব নিকম্মা খদ্দেরদের মোটেও পছন্দ করে না।

মণীন্দ্র গুপ্তর হাত ধরে শুরু করেছিলাম ভাস্কর চক্রবর্তী দিয়ে শেষ করব। একেকদিন ভাস্করদার বাড়ি গিয়ে দেখতাম বইয়ের র‍্যাকে ভাস্করদা কিছু বই সাজিয়ে রেখেছেন। গায়ে দামের স্টিকার— কিছু বই পাওয়া, কিছু সংগ্রহ করা। পাওয়া বইগুলোয় উপহারদাতার নাম খুব যত্ন করে কাঁচি দিয়ে কেটে ক্ষতস্থানে সাদা কাগজ লাগাতেন। আমি এই দোকান থেকে বেশ কিছু বই কনেছিলাম। সবচেয়ে ভালো ক্রয় 'টিপি লকলিন'। পনেরো টাকা দাম ধার্য করেছিলেন ভাস্করদা। বাড়িতে নিয়ে আসা মাত্রই আমার ছেলে আক্ষরিক অর্থে বইটি 'গিলতে' শুরু করে এবং আজও তার প্রিয় বইয়ের তালিকায় 'টিপি লকলিন' অনিবার্য। কিছুদিন পর থেকেই ভাস্করদা বইটি ডাবল দামে 'বাই ব্যাক' করতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হতে পারিনি।

বইয়ের দোকান

অনির্বাণ রায়

ছ-টাকা বাকি রেখে দশ টাকা দিয়ে ভরতি হয়েছিলাম ক্লাস ফাইভে। দিন দুয়েক পরে ক্লাসে পেলাম বুক লিস্ট। সব বই পাওয়া যাবে বাণীবিতানে। রেল-স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পুবদিকে একটু এগিয়ে বাঁয়ে বেঁকে দু-পা এগোলে ওই বাঁ-দিকেই পড়বে বাণীবিতান। ওখানে দেখা পেলাম কানুদার। পাড়ার লোক। ভাই আমাদের বন্ধু। একবারে সব বই পাওয়া গেল না। যেদিন ইতিহাস বই হাতে এল, তার মসৃণ পাতা দেখে মুগ্ধ। ঠিক করলাম এ-বইয়ের পাতায় কোনোদিন দাগ দেব না। দিইওনি। যতটুকু পড়া দেওয়া হত মনে রেখে দিতাম। বলতে গেলে এই প্রথম বইয়ের দোকানের সঙ্গে মোলাকাত। ক্লাস সেভেনে উঠে 'শুকতারা' কেনা শুরু করি। মায়ের কাছ থেকে আট আনা নিয়ে প্রথম বাণীবিতানে যেতাম অর্ডার দিতে। ওরা পারত না আনিয়ে দিতে। এবারে যেতাম কমলা স্টোর্সে। এও বইয়ের দোকান। বাণীবিতানের মতো বড়ো নয়। তবে 'শুকতারা' আনিয়ে দিত। সাতদিন ঘুরে হাতে 'শুকতারা' পেতাম আর নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরতাম। এইরকম একবার ফেরার সময়, অবশ্য শূন্য হাতে, উপহার পেলাম সারাজীবন মনে রাখার মতো একটা সংলাপ। স্যার : কোথায় গিয়েছিলি? 'শুকতারা' কিনতে। গরীবের আবার ঘোড়ারোগ কেন? (তখনও গরীব গরীব ছিল, গরিব হয়নি।) এরপরেও 'শুকতারা' কেনার জন্য কমলা স্টোর্স যাওয়া চালু থাকলেও বাণীবিতান যাওয়া হয়নি। গিয়েছিলাম সেখানে অনেক কাল পরে। কলেজে পড়ার সময়। টিউশনির টাকা থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কবিতার ক্লাস' আর লীলা মজুমদারের 'অবনীন্দ্রনাথ'-এর। দুটোই পেয়েছিলাম যথাসময়ে।

১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের অভিঘাতে কলেজ বন্ধ হল। পড়ালেখা শিকেয়। পরিবারে দুর্যোগ। ঊষাদার সহায়তায় কাজ মিলল কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানিতে। আর পাঁচরকম কাজের সঙ্গে কাউন্টারে বসে বই বিক্রি করে ক্যাশমেমো কাটতে হয়। কখনো কখনো ক্যাটালগ হাতে নিয়ে যেতে হয় দে বুক স্টোর, শৈব্যা, নাথ ব্রাদার্সে। যদি কিছু অর্ডার থাকে। বেশিরভাগ সময় শূন্য হাতে ফিরতে হত। এশিয়া পাবলিশিংয়ের পাশেই ছিল ধীরেন্দ্রলাল ধরের দোকান। বিকেলে আসতেন। আমাদের কাউন্টারে এসে গল্প করতেন। এশিয়ার হাত-নাগালে ছিল হরফ, সাহিত্যসদন, অশোক পুস্তকালয়, নবজাতক। কয়েক পা এগোলে যষ্টিমধু আর নিউ স্ক্রিপ্টের স্টল। ছিল আরও অনেকেই। মনে নেই। কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে বেরোলে পাতিরামের স্টল। সাক্ষাৎ মেলে নানা পত্রপত্রিকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে হাঁটলে ফুটপাথ জুড়ে অজস্র বুকস্টল। পুরোনো বই কেনাবেচা করে। বুক স্টল আর বইয়ের দোকানের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। বইয়ের দোকান বই বিক্রি করে। কেনে না। বুকস্টল— বিশেষত ফুটপাথের— বই বিক্রি করে এবং কেনেও। এমনই একজন পুরোনো বইবিক্রেতা পঞ্চানন দত্ত। হাওড়ায় বাড়ি। গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ তার কাছে বই কিনছি। পঞ্চাননের ভগ্নিপতি তপনদার কাছ থেকেও কিনেছি। ছিল কালাম। তার কাছ থেকে কিনেছি অনেক বই তবে পঞ্চাননের মতো নয়। কত যে ফার্স্ট এডিশন রবীন্দ্রনাথ দিয়েছে পঞ্চানন। গত শতকের সত্তরের দশকে কলেজ স্ট্রিটে তখন বইয়ের দোকানের ছড়াছড়ি। মনে আছে সিগনেট বুকশপ থেকে কিনেছিলাম 'দ্য চিজ ডল' আর 'বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ।' দে বুক স্টোর থেকে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'— দু খণ্ডের— মাত্র পঞ্চাশ টাকায় (নিজের জন্য নয়), সুবর্ণরেখা থেকে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলেজ স্কোয়্যারের পুবে বিশ্বভারতী থেকে অজিত চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'ডাকঘর'।

বই কি কেবল নিজের জন্য কিনেছি? তা নয়। অন্যদের জন্যও কিনতে হয়েছে। তা সে নিজের বা পরের হোক, ঢুঁ দিতে হয়েছে বিভিন্ন বইয়ের দোকানে। এসপ্ল্যানেডে ছিল নিউম্যানের বইয়ের দোকান। ওখানে গিয়েছি। পাইনি তেমন। তবে গ্র্যান্ডের নীচে ফরেন পাবলিশার্সের দোকান থেকে বই কেনা শুরু হয় ১৯৭৭ থেকে। নগদে হোক বা ধারে। খাতা এখনও চালু আছে। বই-সংগ্রহকারীদের অভিন্নহৃদয় বইবান্ধব তপনদা— কিছুদিন আগে প্রয়াত— কত যে বই আনিয়ে দিয়েছেন ইয়ত্তা নেই। এখন টাকা নেই তপনদা। পরে দিস। বিন্দুমাত্র দেরি করেননি তপনদা কথাটা বলতে। তপনদার মতো হাসিমুখে বই জুগিয়ে চলেছে বাবু। ওই ফরেন পাবলিশার্স থেকে। দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল।

পার্ক স্ট্রিটে বেশ কিছু বইয়ের দোকান থাকলেও গিয়েছি বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ান বই দেখতে, এক-আধটা কিনতে আর অক্সফোর্ড বুকস্টোরে। অক্সফোর্ডে এখনও যাই যত না কিনতে, বেশি দেখতে। ওখান থেকে একটা কলম-বিষয়ক বই কেনার কথা ভুলব না। পিকাসো-জীবনীর একটা খণ্ডও ওখান থেকে কেনা।

গোলপার্কে গাঙ্গুরামের দোকানের গায়ে অল্পদিনের জন্য হয়েছিল বিনোদ বুকস্টল। ছোট্ট। ছিমছাম। এখানে দেখেছিলাম পিকাসোর নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। অর্থাভাবে তখন সংগ্রহ করতে পারিনি। বিনোদেই দেখা পেয়েছিলাম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। বই কিনতে বা দেখতে এসেছিলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। আর কাছেই খাদির দোকানের কোনায় ছিল তেওয়ারি বুকস্টল। মূলত পেপারব্যাক রাখত। কিনেছিলাম 'পেঙ্গুইন বুক অফ জাপানিজ ভার্স'। মাত্র এগারো টাকায়। তেওয়ারির আশেপাশে এবং উলটোদিকে একাধিক স্টল। পুরোনো বইয়ের। কত যে বই আর পত্রিকা কিনেছি তার ইয়ত্তা নেই। বলতে গেলে মহাভারত।

শেষ করি জিজ্ঞাসা দিয়ে। জিজ্ঞাসা এখানে প্রশ্ন নয়। বইয়ের দোকানের নাম। ঠিকানা— ১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। 'সন্দেশ' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের সুবাদে পেয়েছিলাম পাঁচ টাকা। মানি অর্ডারে। কী করি? শিল্পী সীতেশ রায়, সাহিত্যে আমার প্রথম সর্বার্থে উৎসাহদাতা, বললেন, বই কেন। জিজ্ঞাসা থেকে কিনেছিলাম প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দ পরিক্রমা'। ওই দোকান থেকেই দেবব্রত বিশ্বাসকে কিনে দিয়েছিলাম 'সাহিত্যের স্বরূপ'। তাঁকে একবার এনে দিয়েছিলাম সদ্য প্রকাশিত বিশ্বভারতী পত্রিকার একটা সংখ্যা। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির জন্য। দেবব্রত বিশ্বাস পত্রিকার দাম দিতে চাইলে প্রবল আপত্তি করি। শেষ পর্যন্ত না পেরে হার স্বীকার করি। আমাকে একটা বই কিনে দিতে চান। কী বই নেবেন? প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দ জিজ্ঞাসা'। কত দাম? বত্রিশ টাকা।

ছোট্ট একটা চিরকুট লিখে পাঠালেন আমাকে জিজ্ঞাসায়। তাঁর পরিচিত বুধুদা অল্প ছাড়ে বইটা দিয়েছিলেন। নিয়ে গেলাম সে-বই দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে। লিখে দিলেন। দুঃখের বিষয় সে-বই পড়তে দিয়ে আর ফেরত পাইনি।

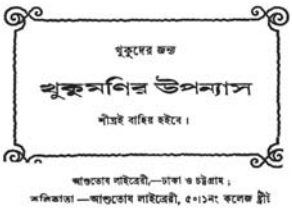

বই-আপণ

রাজীব চক্রবর্তী

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই আমি ছাত্র পড়ানো শুরু করি বই কেনার খরচ সামাল দিতে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে (১৯৯৩ সালে ২২৫ টাকা কম নয়!) সোজা ট্রেন ধরে শিয়ালদা— সেখান থেকে হেঁটে কলেজ স্ট্রিট। সেই সময়ে কলেজ স্ট্রিটে বই কেনার জন্য আমার চেনা সবচেয়ে ভালো দোকান চক্রবর্তী-চ্যাটার্জির দোতলা। আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা একটা মফস্‌সল শহরে। আমরা পিনকোড লিখতুম কলকাতা ৭০০০৫১, কিন্তু কল্লোলিনী কলকাতার ঠাটবাট কিছুই সেখানে ছিল না। কলকাতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়— গজেন মিত্তিরের দেওয়া নাম ধার করে বলা চলে 'কলকাতার কাছেই'। শিয়ালদা স্টেশনটা ছিল আমাদের কাছে কলকাতায় প্রবেশের দরজা। সেরকম একটা জায়গায় বইয়ের জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে ক-টা রাস্তা খোলা ছিল তার একটা হল স্থানীয় বই-খাতা-পেন- পেন্সিলের দোকান। আমি পড়তুম নিমতা হাই ইশকুলে— ইশকুলের উলটো দিকে ছাত্রসাথী নামে একটা বইখাতার দোকান ছিল। সেখানে যে খুব ভালো বই পাওয়া যেত তা নয়, কিন্তু গত শতকের নবম দশকে, যাকে এখন সকলে আশির দশক বলেন (আমি বলি না), ওই দোকানে জায়কো প্রকাশনার কিছু ছবি দেওয়া বিশ্বসাহিত্যের বই পাওয়া যেত সহজ ইংরিজিতে লেখা। বাংলা মিডিয়ামে পড়া আমাদের প্রয়োজন ছিল ইংরিজি শেখার, বা ইংরিজি না-জানার বোধটা আমাদের ভেতরে কাজ করত খুব। তাই ওই সমস্ত বই কিনতুম— দাম ছিল আট টাকা, ছাড় দিয়ে সাত টাকা। ওই দোকানটা ছিল আমার কাছে মরুভূমিতে জলপ্রপাতের মতো। ওই বই কিনে পড়তুম আর 'ভালো ভালো' এক্সপ্রেশন মুখস্থ করে রাখতুম— যা পরবর্তীকালে কাজে দিয়েছে অনেকসময়।

আমাদের বিরাটিতে আনন্দলোক নামে একটা দোকান আজও আছে— আজ তার সে নামডাক নেই। কিন্তু আমাদের বড়ো হয়ে ওঠার দিনগুলোতে আনন্দলোক সারা বিরাটির মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। লেখাপড়ার সামগ্রীর অঢেল আয়োজন তো ছিলই (না, আজকের মতো চোখ ধাঁধানো দোকান নয়— সকলের সমস্তরকম লেখাপড়ার প্রয়োজন মিটত সেই দোকান থেকে), তার সঙ্গে ওঁরা যেটা করতেন তা হল যেকোনো বইয়ের অর্ডার দিলে আনিয়ে দিতেন— অনেকসময় সকালে অর্ডার দিলে বিকেলেই পাওয়া যেত বই। আমি ইশকুলে যেতুম সাইকেল চালিয়ে— বাবা হাতে ২ টাকা দিয়ে রাখতেন সাইকেল বিগড়োলে যাতে রাস্তায় আটকে পড়তে না হয় (২ টাকার হিসেবটা এমনি এমনি নয়— এক চাকার লিক সারাতে ৫০ পয়সা, চাকায় হাওয়া দিতে ১০ পয়সা, সবে মিলে ১ টাকা ২০ পয়সা, আর কিছু খেতে হলে ওই ৮০ পয়সা)! সেই সময়ে কী করে যেন আমার হাতে আনন্দ পাবলিশার্সের একটা তালিকা এসে পড়ে— আমি সেই তালিকা দেখতুম আর সস্তার পছন্দের বইয়ের নামের পাশে ঢ্যাঁড়া দিয়ে রাখতুম। ১২ টাকা দামের বেশ কিছু বই ছিল ওই তালিকায়— ছাড় দিয়ে দাম হত ১০ টাকা ৮০ পয়সা। বাবার দেওয়া ২ টাকাই আমার মূলধন— প্রায় দিনই সাইকেল বিগড়োত বলে বাড়িতে রিপোর্ট করতুম। ফলে দেড় সপ্তাহেই একটা বই কেনার টাকা উঠে আসত। এভাবে যা কিনেছি তা আজও আমার কাছে রয়েছে— 'ধূমকেতু রহস্য ও হ্যালি' (অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'শব্দ নিয়ে', 'সাহিত্য নিয়ে' (বিকাশ বসু), 'ইতিহাস ও সাহিত্য' (অশীন দাশগুপ্ত), 'মা টেরেসা' (সুদেব রায়চৌধুরী), 'বাংলা ভাষার সাত সতেরো' (সুভাষ ভট্টাচার্য), 'জন্মদিনের মুখর তিথি' (সুনীল দাস), 'ছবির নাম সত্যজিৎ' (মানসী দাশগুপ্ত), 'উপকথা' (শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক অনুবাদিত), 'নীতি, যুক্তি ও ধর্ম' (বিমলকৃষ্ণ

মতিলাল), 'বাংলার স্থাননাম' (সুকুমার সেন), 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়), 'নিষিদ্ধ নজরুল' (শিশির কর)...

শুধু আনন্দ পাবলিশার্সের বই-ই তো নয়! দে'জ, প্রমা, প্যাপিরাস, সুবর্ণরেখা, ভারবি, সাহিত্য সংসদের বইও থাকত মাঝে মাঝে। আমার পছন্দের পাল্লা ভারি হয়ে থাকত প্রবন্ধের বইয়ের দিকে। আমার জন্ম এক উদ্বাস্তু পরিবারে। বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলে পড়ুক, কিন্তু সাধ্য সাধের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না প্রায়ই। বই কেনার যেমন হাজার অছিলা আজ আমাদের পুত্র বের করে, আমার সেরকম কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু যখন যতটুকু টাকা পেয়েছি বা হাতে এসেছে তাতে বই ছাড়া আর কিছু আজ পর্যন্ত কিনিনি— এখন অবশ্য বইয়ের সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড কেনার একটা নেশাও বেশ পেয়ে বসেছে (আগে অবশ্য ক্যাসেট কেনার নেশাও বেশ জ্বালিয়েছে আমায়)। একটা সময় অবশ্য ভালো বই দেখলে মায়ের ব্যাগ থেকেও টাকা সরিয়েছি, বাবার পকেট বা ব্যাগ থেকে টাকা নেওয়ার সাহস আমার কোনোদিন হয়নি। আমি যখন সংস্কৃত কলেজে ভরতি হই ভাষাবিজ্ঞানের সাম্মানিক পাঠক্রমে আমার বাবা খুব নাখোশ হয়েছিলেন আমার উপরে। কিন্তু আমাকে বেশ কিছু বই কেনার টাকা দিয়েছেন শুধু নয়, সঙ্গে গিয়ে কলকাতা বইমেলা থেকে বই বয়েও এনেছেন আমার সঙ্গে। মনে পড়ে সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'Encyclopaedia of Indian Literature' (৬ খণ্ড), 'পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী' (১৪ খণ্ড), কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত ডেভিড ক্রিস্টালের 'Encyclopaedia of English Language', 'Enclyclopaedia of Language', কলিন পি. মাসিকার 'The Indo-Aryan Languages', লংম্যান থেকে প্রকাশিত R. H. Robins-এর 'Introduction to General Linguistics', ন্যু ইয়র্ক-এর Henry Holt and Company থেকে প্রকাশিত লেনার্ড ব্লুমফিল্ডের 'Language', মোতিলাল বাণারসী দাস প্রকাশিত আর এল টার্নারের 'A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages' (৪ খণ্ড)-এর মতো বেশ কিছু বই কিনতে আমার বাবা আমাকে টাকা এবং শ্রম দুই-ই দিয়েছিলেন।

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। ইশকুলের বাংলার মাস্টারমশাই পরিতোষবাবু (পরে যিনি 'বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী : প্রাচীন ও মধ্যযুগ' নামে একটি বই লিখেবেন— আটষট্টি বছর বয়সে জমা দিয়ে পিএইচডি-পাওয়া থিসিসের বিস্তার করে) ক্লাসে পড়াতে গিয়ে প্রায়ই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এর কথা বলতেন— ওই অভিধান তাঁর মতে বাংলার প্রথম সব অর্থে আধুনিক অভিধান। পুজোর সময় বায়না ধরলাম— পুজোয় আমার নতুন জামা লাগবে না, আমার চাই 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'। সে-অভিধানের দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ (১৯৮৮) করেছে সাহিত্য সংসদ। ২২০ টাকা দাম। আনন্দলোক এনে দিতে পারল না। পুজোর আগে একদিন আমি আর বাবা কলেজ স্ট্রিটে ওই বই খুঁজতে খুঁজতে দে'জ-এর খোঁজ পাই। মনে আছে ১৯৮ টাকায় সে-বই কেনা হল। তখন বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' পড়তে শুরু করেছি— ব্যুৎপত্তি দেখে শব্দের অর্থ বুঝতে বুঝতে ওই অভিধানই হয়তো পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞান পড়ার দিকে আমাকে চালিত করে থাকবে।

আমার বই কেনা পুরোদস্তুর শুরু হল কলেজে ভরতি হওয়ার পরে। ছাত্র (ছাত্রীও) পড়িয়ে যা পেতাম সব বই কেনায় যেত। কোনোদিন রাস্তায় কিছু কিনে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না— সব পয়সাই বই কেনায় যেত। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে ঘুরে বেড়ানো সেদিন থেকে আজও আমার প্রিয়তম ব্যসন। কত বই যে ওখান থেকে পেয়েছি! একবার কলুটোলা স্ট্রিটে একজনের কাছে দেখলাম ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সুকুমার সেনের 'Old Persian Inscriptions of

the Achaemenian Emperors' বইটা। দাম জিগ্যেস করলুম— ১০০ টাকা। অত টাকা তো নেই! বললুম— এ-বই কে পড়ে? বিক্রেতা জানালেন— খুব ডিমান্ড আছে এই বইয়ের। আমি বললুম— হতেই পারে না, এ-বই কেনার লোক নেই কলকাতায় বেশি। আমি ঝোলাঝুলি করলুম, বললুম— যে-বিভাগে এ-বই পড়ানো হয়, আমি সে-বিভাগের ছাত্র। আমার খুব কাজে লাগবে এই বই। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— কত দিতে পারবে? বললুম— ১০ টাকা। আমাকে ১৫ টাকায় বইটি দিয়েছিলেন। একবার বইমেলায় সুবর্ণরেখার স্টলে দেখি গ্রিয়ারসনের 'Linguistic Survey of India' (LSI)-র কয়েকটি পুরোনো খণ্ড। LSI-এর প্রথম খণ্ডটি হল মোট ১১ খণ্ডের বইটির প্রবেশক— এক খণ্ডে মোটামুটি পুরো বইয়ের একটা সংক্ষিপ্তসার সে-খণ্ডে ধরা আছে। ইন্দ্রনাথবাবু তখন জীবিত— বসে আছেন এক কোনায়, কিছুটা তুরীয় মার্গে! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম— এই খণ্ডের দাম কত? উনি কিছুটা ঝাঁঝিয়ে বললেন— অনেক দাম! আমি আবার বললুম— কত? তখন জিজ্ঞাসা করলেন— এ-বই নিয়ে তোমার কী কাজ? তুমি জানো এতে কী আছে? বললুম— জানি, আমি এই বিষয় নিয়েই পড়ি। বললেন— বটে! আরও দু-একটা কথা বলে যখন নিশ্চিত হলেন, জানতে চাইলেন আমি কত দিতে পারব। বললুম— ১০০ টাকা। বললেন— দাও আর বই নিয়ে বেরিয়ে যাও। পরে LSI-এর পুরো সেট কিনেছি, কিন্তু ওই একটি খণ্ড কেনার আনন্দ হয়নি তাতে।

অনার্স এবং এম এ পড়ার সময় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বই দিতে আসা কয়েকজন বই বিক্রেতার সঙ্গে সখ্য তৈরি হয়ে যায়। তাঁরা আমাকে ধারে বই দিয়েছেন ধীরে ধীরে টাকা শোধ করেছি। শ্রীশচন্দ্র বসুর 'The Aṣṭādhyāyī of Pāṇini', জর্জ কার্ডোনার 'Pāṇini- His Works and Traditions' (Vol. ১), মনিয়ের মনিয়ের-উইলিয়মসের সংস্কৃত-ইংরিজি অভিধান, বটকৃষ্ণ ঘোষের ইংরিজি অনুবাদে ভিলহেম গাইগার-এর 'Pali Language and Literature', জন বিম্‌স-এর 'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India'-এর মতো কত বই যে ওই সময়ে কেনা!

এম এ পাস করে গেলাম মহীশূর— ওখানে কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থানে (সিআইআইএল) গবেষক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে বই কেনায় আরও গতি এল। মহীশূর শহরে গীতা বুক হাউজ নামে একটি বেশ ভালো দোকান ছিল তখন (এখনকার কথা জানি না)। ওখানে গিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বইয়ের একটা নতুন দিক আবিষ্কৃত হল যেন। এর আগে ২০০০ সালে একবার ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম চেন্নাইতে। সেখানে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক বই-পত্রের সম্ভার বসেছিল— সেটা আমার সামনে বইয়ের একটা নতুন দিক খুলে দেয়। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই ওভাবে। একবার মহীশূরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল বিভাগের প্রধান আসেন সিআইআইএল-এ একটা সম্মেলনে। তখন আমার তামিল ভাষার একটা প্রামাণ্য অভিধান জোগাড় করার রোখ চেপেছে— আগের বছর ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে গিয়ে সে-বই দেখে এসেছি। সাত খণ্ডে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত তামিল-ইংরিজি অভিধান। আমি পরিচয় পর্ব সেরে ওই অধ্যাপককে অনুরোধ করি ওই অভিধান এবং রবার্ট কলডওয়েল লিখিত 'A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages' (যা ১৯৫৬ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়) বইটি কি জোগাড় করতে তিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন? আজ এই বয়সে একজন অপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে এরকম অনুরোধ করতে পারব বলে মনে হয় না। কিন্তু সেদিন করেছিলাম। তিনিও আমায় কথা

দিয়েছিলেন পাঠাবেন— আমার ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি ফিরে যাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় আমি সিআইআইএল-এ বসে ওই সাত খণ্ডের অভিধান এবং ব্যাকরণ বইটি পেয়েছিলাম, সঙ্গে একটি চিঠি এবং একটি রসিদ। চিঠিতে লেখা ছিল কোন ঠিকানায় এবং কার নামে চেক লিখে পাঠাতে হবে। আজকে এরকম সাহায্য কি আমিই ওই বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়েকে করব?

সিআইআইএল থেকে একবার বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য গিয়েছিলাম সিমলায় ভাষিক ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য। ছিলাম গ্র্যান্ড হোটেলে— সরকারি ভাড়া দিনে মাথাপিছু ১৭.৫০। খাওয়ার খরচ প্রতিবেলায় ওই টাকার প্রায় ছয় থেকে পনেরো গুণ। আমরা দিনে যে-টাকা ভাতা পেতাম সরকারি হারে তাতে খেয়ে বেঁচে থাকা কঠিন শধু নয়, নামুমকিন! কী করি! খুঁজে দেখলাম সিমলা কালীবাড়িতে একবেলা খেতে লাগে মাথা পিছু ১৩ টাকা। ফলে আমাদের টাকা উদ্বৃত্ত হল— ওই টাকা কি জমানোর জন্য! দেদার বই কেনা চলতে লাগল। সিমলায় মিনার্ভা নামে যে বইয়ের দোকান আছে সেটি প্রতি বিকেল সন্ধ্যায় আমাদের গন্তব্য হয়ে উঠল। 'The Second Sex', 'A History of Western Philosophy' Edward FitzGerald-এর ইংরিজি অনুবাদে ওমর খৈয়ামের রুবাই-এর অলংকৃত সংস্করণ।

বই কেনার আরও এক ঢেউ এসেছিল ২০১০ সালে বাংলাদেশে নতুন করে যাওয়া শুরু করার পর থেকে। ঢাকার বাংলা একাডেমির উদ্‌যোগে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখার কাজে নিয়মিত যেতে শুরু করি ২০১০-এর ডিসেম্বর থেকে। বাংলাদেশের বই-এর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের বই-এর বাজারে। প্রথম যে দোকানে যাই সেটি পাঠক সমাবেশ। এখন পাঠক সমাবেশের যে বিরাট গ্রন্থবিপণি তৈরি হয়েছে জাতীয় জাদুঘরের পাশের জমিতে সেটা সেসময় ছিল না। উলটো দিকে ছোটো একটি দোকান, যেটা এখনও আছে, ছিল। আর ছিল প্যাপিরাস, তক্ষশীলা, বিদিত, সন্ধিপাঠ নামে বেশ কয়েকটা দোকান। আমাকে প্রথম দিন নিয়ে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাহবুবুল হক। প্রথম দিনই খান পঞ্চাশেক বই কেনা হয়— মাহবুবুল হক স্যারকে বলেছিলাম '৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা '৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্য বা সামগ্রিক লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। সেই শুরু। তারপরে আমি একাই সে-বাজারে অভিযান চালাতে থাকি। অসংখ্য বই কেনা চলতে থাকে। যতবার বাংলাদেশে গিয়েছি বা ওখান থেকে আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব এসেছেন একমাত্র বই-ই আনা নেওয়া হয়েছে— আজও হয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে আজিজ সুপার মার্কেটের বইয়ের দোকানগুলোর কয়েকটা বন্ধ হয়ে গেল অবশ্যই কয়েকটা বড়ো দোকান আজও আছে। কিন্তু বইয়ের মূল ব্যাবসাটা চলে গেল— আজিজের কোনাকুনি উলটো দিকে কাঁটাবনের কনকর্ড এম্পোরিয়ামে। কয়েকবার যাওয়া হয়েছে বন্ধুসমভিব্যাহারে বাংলা বাজারে। বাংলা বাজারে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রকাশনা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়। সরু গলি আর তার মধ্যে ততোধিক অপ্রশস্ত উপগলির মধ্যে প্রকাশনা সংস্থার অফিস— সেখানে ঘুরে ঘুরে বই কেনার সময় কলেজ স্ট্রিটে কাটানো আমার ছাত্রবয়সের কথা মনে পড়ে।

ঢাকায় ২০১০-এ বাতিঘরের আধুনিক বিপণিটি তৈরি হয়নি বাংলা মোটরের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বাড়িতে। আমি চট্টগ্রামের বাতিঘরে গিয়েছি চেরাগি পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে তারা প্রথম শুরু করে। আজকে বাতিঘর সারা বাংলাদেশে বইয়ের ব্যাবসায় একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঢাকার শান্তিনগরে পাঞ্জেরী প্রকাশনার একটি চমৎকার বইয়ের দোকান ছিল। এইসব দোকানে আমার নিয়মিত ঢুঁ মারা চলত। আর ছিল বাংলা একাডেমির বিক্রয়কেন্দ্র। আমরা যেহেতু বাংলা একাডেমিতেই কাজ করতাম, বাংলা একাডেমির বই কেনা এবং উপহার পাওয়া আমার ভবিতব্য হয়ে ওঠে।

দৃষ্টফল চিকিৎসা

এরই সঙ্গে ঢাকায় আরও একটি জায়গা আমার গন্তব্য হয়ে উঠেছে— নীলক্ষেত, স্থানীয় উচ্চারণে 'নীলখ্যাত'। পুরোনো বইয়ের স্বর্গ যেন। বাংলা একাডেমিতে প্রতিদিনের কাজের শেষে বিকেলবেলা নীলক্ষেতে ঢুঁ মারা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কতশত বই যে সেখান থেকে কিনেছি! একবার মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান-এর 'মোস্তফা চরিত' বইটি দরকার ব্যাকরণের কাজে। বইটি ছাপা নেই। চলে গেলাম নীলক্ষেতে— পেয়েও গেলাম আকন বুক সেন্টার বা ওই জাতীয় একটা দোকানে। নীলক্ষেতে পাওয়া যায় না এমন পুরোনো বই বোধ করি নেই। নীলক্ষেতে আর আছে ফোটোকপির সাম্রাজ্য। ফোটোকপি যে আসল বইকে টেক্কা দিতে পারে তা নীলক্ষেতে না গেলে জানতে পারতাম না। নীলক্ষেত ছাড়া পুরোনো ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের সামনের ফুটপাথে বেশ পুরোনো বই পাওয়া যায়— বিশেষত পুরোনো রাশিয়ান বই। সেখান থেকেই ইয়ান ইয়েফ্রেমভ-এর 'ফেনার রাজ্য' নামে একটি বই কিনেছিলাম যা তার ২০ বছর আগে এক প্রেম-প্রত্যাশী যুবক তাঁর বান্ধবীকে উপহার দিয়েছিলেন। বইটি ফুটপাথে আসার কারণ প্রেমের পরাজয়, না কি বিবাহে তার পরিসমাপ্তি সেই ধন্দ রয়ে গেল।

ঢাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে আমি প্রায় ৪০০ কেজি বই এনেছি— সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

আমার বই চেনা আর বই জানা

শুভঙ্কর দে

'আমার বই-দোকান ঘোরা' বিষয়টা আমার কাছে অনেকটা মিষ্টির দোকানিকে জিজ্ঞাসা করার মতো 'আপনি কোন দোকান থেকে মিষ্টি কেনেন?' পারিবারিক সূত্রে বাবা-কাকু আমাদের একটা আস্ত বইয়ের দোকান উপহার দিয়েছেন। উপহার পেয়ে আমি তো বেজায় খুশি। উপহার যে কবে কাঁধে চেপে বসল, বুঝতেই পারিনি। এই উপহারের সঙ্গেই আমার শৈশবে দেখা, ঘোরা প্রথম বইয়ের দোকান।

বাবার হাত ধরে বইপাড়ার মধ্যে দিয়ে যখন আমি হিন্দু স্কুলে যেতাম তখন দেখতাম বই-দোকানগুলো সব বন্ধ। সেই আটের দশকের গোড়ায় সাতসকালের বইপাড়ায় সংস্কৃত কলেজের গেটের পাশে একমাত্র চায়ের দোকান খোলা থাকত। সেই চায়ের দোকানও এখন খাতা-পেনের দোকান হয়ে গেছে। বইয়ের দোকান খুলত আমার স্কুল ছুটির সময়। স্কুল ছুটির পরে মায়ের হাত ধরে পারিবারিক বই-দোকান ঘোরা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। বই পড়ব বলে বই-দোকানে ঢুকতাম না, আড্ডা দেব বলে চলে আসতাম দোকানে। কতজনকে দেখতাম আমাদের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বই কেনার অপেক্ষায়। আমারও যে কিনতে মন চাইত না এমনটা নয়। কিন্তু নিজের উপহার পাওয়া দোকান থেকে কী বই কিনব বুঝতে পারতাম না। কখনো কাকুর থেকে, কখনো আমার মেজো জেঠুর থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে রত্না বুক স্টলে চলে যেতাম। ওখান থেকে আমার ভীষণ পছন্দের 'অমর চিত্রকথা' কিনতাম, কখনো বেতাল, আবার কখনো ম্যানড্রেক। বইগুলোর দাম তিন টাকা, আমার থেকে নিত দু-টাকা পঁচিশ পয়সা। দুটো কিনে বেঁচে থাকত পঞ্চাশ পয়সা, সেই দিয়ে পরেরদিন স্কুলে একটা বিলিতি আমড়া হয়ে যেত। এই প্রথম আমার কোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে বই কেনা।

স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে মহানন্দে দিন কাটত। রেজাল্টের দিন যত ঘনিয়ে আসত মনে হত নতুন ক্লাসের বুকলিস্ট এবার আর পাব না। রেজাল্ট প্রকাশিত হত— কোনোমতে উত্তীর্ণ। মার্কশিটের সঙ্গে নতুন বুকলিস্টও হাতে পেয়ে যেতাম। সেই বুকলিস্ট নিয়ে কখনো কালীমাতা বুক স্টলে নয়তো বিশ্বাস বুক স্টলে দীর্ঘ লাইনের পেছনে মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার স্কুলজীবন-কলেজজীবনের সেই দীর্ঘসময় বিশ্বাস বুক স্টল কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আজ যখন সেই দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই কর্মব্যস্ততায়, দেখি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ সেই বিশ্বাস বুক স্টল।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বারো দিনের বইমেলায় আমার রোজ যাওয়া চাই। মেলায় ঘোরা আর বইয়ের দোকান দেখায় একটা আলাদা আনন্দ ছিল। আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ময়দানে দুটো বইমেলা হত। একটা 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা' আর একটি আমাদের জনপ্রিয় 'কলকাতা পুস্তকমেলা'। পার্ক স্ট্রিটের মাঠে তখনও বইমেলা স্থান পায়নি। কলকাতা পুস্তকমেলার পাশে তখন এক্সপো অথবা লেক্সপো মেলা চলত। বাবা-কাকুর বইমেলায় দে'জ সামলানো, আর মায়ের হাত ধরে আমার সব মেলায় ঘোরার মধ্যে দিয়েই কখন যেন বড়ো হয়ে গেছি।

২

বইমেলায় বই-দোকানে বই খোঁজা, বই কেনায় একটা অন্য রকম ভালোলাগা কাজ করে। আমি যখন ক্লাস টু, তখন প্রথম বাবার সঙ্গে ত্রিপুরা বইমেলায় যাই। মনে আছে এন বি টি-র স্টল থেকে দশ টাকা দামের ছোটোদের অনুবাদের কোনো একটি বই কিনেছিলাম। টেন পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে ন-টাকা দাম

নিয়েছিল। সেই বই আর ক্যাশমেমো নিয়ে সরকারি ভরতুকির কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ক্যাশমেমোতে আরও অতিরিক্ত দশ শতাংশ ছাড় দিয়ে স্ট্যাম্প মেরে হাতে এক টাকার নোট ধরিয়ে দিয়েছিল।

হাঁদা ভোঁদা আর নন্টে ফন্টে কেনার জন্য বইমেলায় দেব সাহিত্য কুটীরে যাওয়া ছিল বাঁধাধরা। ছোটো মিনি 'আবোল তাবোল', অদ্ভুত আকৃতির বই 'আলিবাবা চল্লিশ চোর'— এরকম নানান আকৃতির অদ্ভুত বই বিক্রি হত বিদ্যা মন্দিরে। প্রতি বছর যা নতুন বই প্রকাশিত হত, তা সংগ্রহ করে ফেলতাম। মেলায় আর একটা দোকানে যেতাম, তার নাম হাউস অফ পাজল। নানান ধরনের পাজল বিক্রি হত। বইমেলায় সারি সারি বইয়ের দোকানের মাঝে হাউস অফ পাজল ছিল আমার খুব পছন্দের স্টল। আর ছিল অভ্যুদয় প্রকাশনী। এই স্টল ছিল ছোটোদের স্বর্গরাজ্য। অবন ঠাকুর, প্রেমেন্দ্র মিত্র আরও অনেকের কিশোর সঞ্চয়নের সংকলনগুলি ছিল অসাধারণ।

কিশোরবেলা কেটে কখন যেন আমাদের বই-দোকানে বসার দায়িত্ব এসে পড়ল। যে-দোকানে আমার সারা বছর মেলা বইয়ের ঠেক। আর এই ঠেক ছেড়ে অন্য ঠেকে কেনই-বা যাব। পার্ক স্ট্রিটের মাঠে তখন কলকাতা বইমেলার ঠিকানা। বইমেলা শুরুর আগে অন্তত তিন-চারদিন মেলা ঘুরতাম। দেখতাম কোথায় কোন প্রকাশকের স্টল আছে। বইমেলায় দে'জ-এর স্টলের মাঝে বইয়ের পেজির ওপরে বসতাম আর জায়গাটা হয়ে যেত ইনফরমেশন সেন্টার। পাঠক প্রবেশ করেই যখন অন্য কোনো প্রকাশকের বইয়ের খোঁজ নিতেন, তাঁকে সেই বইয়ের প্রকাশক ময়দানের মাঠে কোথায় আছে, কীভাবে সেই পাঠক যাবেন তার হদিশ দিতাম, অনেকটা গুগল ম্যাপের মতো। এই ভাবেই বই, বইয়ের দোকানে আমার মানস ভ্রমণ হত।

৩

স্কুল পাস করে, কলেজ ফেল করে কাজ শেখার জন্য বই-দোকানে বসতে শুরু করলাম। লেখক থেকে সম্পাদকের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের কথা শুনতাম। আর এই শোনার, জানার মধ্যে দিয়ে আমার বই চেনা, বই জানা আর এক অন্য ধরনের বই খোঁজার সন্ধান শুরু হল। তখন মহাশ্বেতা দেবীর রচনাবলির কাজ করছেন অজয় গুপ্ত। অজয় জেঠুর জোগাড়ে হয়ে মহাশ্বেতা দেবীর লেখার খোঁজ শুরু করলাম বইপাড়ার ফুটপাথে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের গায়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে ৩৪ নম্বর, ৩৬ নম্বর, ১৫ নম্বর স্টলগুলোয় পুরোনো বই, পত্রপত্রিকা খোঁজার মধ্যে দিয়ে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একটা সময় গেছে যখন কলুটোলা স্ট্রিটের ফুটপাথ আমার প্রতিদিনের তিন ঘণ্টার ঠিকানা ছিল। আর সেই ফুটপাথ থেকে কেনা বইয়ের মধ্যে কখনো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সই, কখনো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজের বই সই করে উপহার দিয়েছিলেন রাজেশ্বরী দত্তকে। কোনো এক সুভাষকে 'সেরা সন্দেশ' সত্যজিৎ রায় উপহার দিয়েছেন সই করে। বন্ধুত্ব হয়ে যায় রেহান, অর্ধ, তুহিনদের সঙ্গে। এঁরা পুরোনো, দুষ্প্রাপ্য বই বিক্রি করেন। এঁদের বইয়ের সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে আমার বইকে চিনতে শেখা। বইমেলায় ক্যাম্প-এর স্টলে স্বপনদার থেকে বই সংগ্রহ করতাম। এইভাবে বই, পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতে করতে দে'জ পাবলিশিং-এর নিজস্ব একটা আস্ত লাইব্রেরি কখন যেন গড়ে উঠল।

জেলায় জেলায় বইমেলাতে দে'জ-এর দোকানে বসা ছিল আমার কর্মজীবনের হাতেখড়ি। দোকানে বসা, বই বিক্রি করা, পাঠকের সঙ্গে কথা বলা— এক নতুন অভিজ্ঞতা জমতে থাকে জীবনে। এর মাঝেই

কখনো কখনো পুরোনো বইয়ের স্টলে বই খোঁজা চলতে থাকত। মনে পড়ে ত্রিপুরা বইমেলায় সুবর্ণরেখার স্টল থেকে 'অসম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি', চার খণ্ডে বাঁধানো 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' কিনে নিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়।

৪

২০১০ সাল। আমেরিকায় বিশ্ব বঙ্গসম্মেলন। নিউইয়র্কে মুক্তধারার বইমেলা, তারপরে আটলান্টিক সিটিতে বঙ্গসম্মেলন। আমার আমেরিকা যাওয়ার কথা শুনে আমার মাস্টারমশাই শিবশঙ্করবাবু একটি বই কিনে নিয়ে আসার জন্য বললেন। বইয়ের নাম তিনকার্স (Tinkers)। পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত এই বইটি সুদূর আমেরিকা থেকে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ল। স্যার একটি বইয়ের দোকানের নাম বললেন, 'বার্নস অ্যান্ড নোবেল'। নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যাই বিখ্যাত এই বইয়ের দোকানে। দোকানের একতলায় শুধু ছোটোদের বই, ছোটোদের এক রূপকথার জগৎ তৈরি করা। দোতলায় লিটারেচার বই। নানান জায়গায় কম্পিউটারের স্ক্রিন। স্ক্রিনে বইয়ের নাম টাইপ করলে দোকানের ম্যাপ বেরিয়ে আসে। বইটি সংগ্রহ করতে কীভাবে বইটির কাছে পৌঁছোতে হবে তা দেখিয়ে দেয়। এমন একটা বইয়ের দোকান দেখে ইচ্ছে হয় বাংলার বুকেও যদি এমন একটা বাংলা বইয়ের স্বপ্নরাজ্য কোনোদিন গড়ে তোলা যায়। যেখানে পাঠকেরা খুঁজে নেবেন তাঁদের পছন্দের বই।

ধারাবাহিক

সুধন্য সরকার

হাত নিশপিশ করে, ছুঁয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা রহস্য আর মজায় ভরা। বাহাদুর বেড়াল, টিনটিনের চুল, ক্যাপ্টেন হ্যাডকের দাড়ি ছুঁয়ে দেখাতেই মজা। বড়োরা কাগজ পড়ে। আমার নজর তারে বাঁধা ক্লিপে ঝোলা ম্যাগাজিনে। একটার পর একটা পড়ে ফেলি। বাকিটা ভেতরের পাতায়। ছোটোখাটো চেহারার তপাদা। খুব ভোরে এলে দেখা যায়, কী ব্যস্ত কী ব্যস্ত! কাগজের পাহাড়। তপাদা গোনে। এক হাতের তালুতে পাঁচ আঙুলে বাঁধা, গুচ্ছ খবরের কাগজ। মেলে দেয়, খুলে ফেলে; ছড়িয়ে যায় অপর প্রান্ত। যেন কাগজের ফুল। তপাদা গোনে; দশটা 'আনন্দবাজার', চারটে 'আজকাল', তিনটে 'বর্তমান', ছ-টা 'টেলিগ্রাফ', দুটো 'স্টেটসম্যান', তিনটে 'প্রতিদিন'। সাথে চারটে 'আনন্দমেলা', দুটো 'আনন্দলোক', পাঁচটা 'শুকতারা', ছ-টা 'সাপ্তাহিক বর্তমান'। ছোকরা কাগজওয়ালা তুরন্ত কায়দায় সাইকেলে রাখা ব্যাগে ভরে সেসব। হিসেব আরও বাড়ে, কমে। যা যা তাড়াতাড়ি যা, গৃহস্থের বাড়িতে চায়ের জলের আগে কাগজ পৌঁছানো চাই।

এক উঠতি বালক। ইস্কুলে পড়ে। বন্ধুর সাথে রোজই আসে পাড়ার মোড়ে বাসস্ট্যান্ডে। সৈনিক হতে চায় সে। স্বপ্ন দেখে বুড়িবালামের তীরে গুলি ছুড়ছে। কত কত দুশমন খতম করে, তবুও ছুটে আসা গুলি তাকেও যেন কোথায় জখম করে।

ভাবেনি সে বইওয়ালা হবে। বইয়ের দোকান হবে তার।

জীবন সহজ হয় না, হতে পারে না। 'কর্মক্ষেত্র', 'কর্মসংস্থান' নিমেষে হাওয়া হয়ে যায়। তরুণ মুখগুলি, যুবক মুখগুলি কেনে সেসব। তপাদা ঠিকানা লেখা খামও রাখে। স্নেহের পরিচিতজনদের মনে করিয়ে দেয়; আরে! এই ফর্মটা ফিলাপ করিসনি? আগামী পরশু কিন্তু শেষ দিন। এখনও দুটো ফর্ম লুকিয়ে রেখেছি তোদের জন্য। যা কাছেই তো; ফিলাপ করে জমা দিয়ে আয়। কয়েকদিন দেখিনি তোকে, নিয়ে যা, টাকা না থাকলে পরে দিস।

উজ্জ্বল চোখ ফর্ম, খামের সাথে একটা 'পেশাপ্রবেশ'ও নিয়ে যায় ধারে। প্রস্তুত হতে হবে। ইয়ারলি একটা জি.কে-র বই আছে আগেই। মাসিক আর সাপ্তাহিক জি.কে এখানে এসেই পড়ে নেবে ঠিক করে। দরকারে, প্রয়োজনে কিনতেও পারে।

মধুদা পাড়ার কোচিং মাস্টার। সকলেরই দাদা তিনি। জনপ্রিয়তা তাঁর আকাশছোঁয়া। যদি দেখেন পড়াশুনার বইয়ের বাইরেও আগ্রহ আছে কারও, উৎসাহিত করেন খবরের কাগজ, বই, ম্যাগাজিন পড়বার জন্য। অতি উৎসাহীদের 'অগ্রণী পাঠাগার'-এ কার্ড করিয়ে দেন নিজের খরচায়। মাসিক চাঁদাও। ফ্রিতে টিউশনির সংখ্যাও কম নয় তাঁর। তেমনই এক অতি উৎসাহী বালক 'অগ্রণী পাঠাগার'-এ গিয়ে পড়ে ফেলেছিল 'দাদুর চশমা।' রাশিয়ান বই, বাংলা অনুবাদে। সে-বইয়ের ছবি আর কোথা থেকে জোগাড় করা আতস কাচের কথা কোনোদিন ভুলতে পারেনি সে। চশমা তৈরির ইতিহাস জেনে ফেলেছিল সেই কোন ছেলেবেলায়।

এক একটা মানুষ যেন জানে কত কিছু। এমনটা মনে হয়। মলিন ধুতি-পাঞ্জাবি টাক মাথার বেঢপ ভুঁড়িওয়ালা মানুষটার নাম জানা হয়নি কখনো। দু-পাশের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে থামছে আর কিছু সময় দাঁড়িয়েই আবার ছুটতে শুরু করছে। সেসবে খেয়াল নেই তাঁর অথবা আছে খুব। তাঁকে সবসময় এক পাশে এলিয়ে থাকতে দেখেছি। বুকসমান উঁচু ম্যাগাজিন ডিসপ্লের পেছনে। তেমনই কিছুটা ডিসপ্লের

তক্তপোশে। কখনো ঝুঁকে সামনে এলে দেখা যেত তাঁর পিঠে আড়াআড়ি লম্বা একটা দাগ। তখন বুঝিনি; এখন বুঝতে পারি কেন এই দাগ। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের তারাও যেন কেমন স্থির আর নিষ্পলক। মুখটা গম্ভীর অথচ বিনয়ে ভরা। আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল এখানে। কাঁচের শো-কেসগুলোতে ছিল বিভিন্ন বাংলা, ইংরেজি আর হিন্দি বই। লম্বালম্বি দাঁড় করানো। বেশিরভাগ বইয়ের প্রচ্ছদ ছিল রঙিন চমকদার। পথচলতি মানুষের চোখ টানবেই টানবে। বিস্ময়ে দেখতাম আমি, আমার মতন হাজারও মানুষ। কোনো কোনো বই আবার দীর্ঘদিন একইভাবে এক জায়গায় থাকার ফলে, এক কোণ মুড়ে গিয়ে কাত হয়ে থাকত। জমত ধুলো, মাকড়সার জালের মতো ঝুলকালিও। ছোটো কাঠের লাঠির মাথায় কিছুটা কাপড়ের টুকরো বেঁধে বানানো থাকত ধুলো ঝাড়বার হাতিয়ার। ধুলো ছাড়াও পাগল আর ভবঘুরেদের তাড়ানোর জন্যও ব্যবহার করতেন এটি। মাঝে মাঝেই তিনি এটা হাতে নিয়ে সামনের খবরের কাগজগুলির উপরে নাড়াচাড়া করতেন। দোকানের কোনায় কোনায় জমে থাকা ঝুল, বুলিয়ে নিতেন লাঠির হাত। ঝকমকে আর ঝলমলে হয়ে উঠত তাঁর দোকান। কিন্তু ধুলো আর ঝুলেরা পালাত না কোথাও। তাঁর চুল, মুখ আর শরীরের পোশাকেই এসে আঁটতে থাকত।

কেন বললাম, একটা মানুষ যেন জানে কত কিছু! আসলে বইয়ের দোকানে বসা মানুষটিকে সকলেই ভাবে, ভেতরে যা বই আছে সবই বোধহয় সেই মানুষটা পড়ে ফেলেছে। আর সে সেইসব বই সম্বন্ধে জানে। আসলে অধীর অপেক্ষা আর আকুল-ব্যাকুলে তার দিন যায়। কেউ বুঝতেই পারে না।

বিস্ময় উপস্থিত হয় তারে ঝোলা ম্যাগাজিনগুলোকে দেখে। বাহাদুর বেড়ালের কার্টুন, তার ওই সামান্য কয়েকখানা ছবি, মাছভাজা, ধোঁয়া ওঠা উনুন গোগ্রাসে গিলত চোখ। বাকি অংশ 'ভেতরের পাতায়' অথবা 'চলবে' মনকে চঞ্চল করে তোলে। আনচান করে তুলত 'বাকি অংশ' পড়ে ফেলতে। এমনই বয়সভেদে আরও নানা ম্যাগাজিনের সামনের পাতা, কভারই ছিল এইসব দোকানের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বইওয়ালাকে তাই তার দোকানের ডিসপ্লে সম্বন্ধে খুব চতুর ধারণা রাখতে হয়। দোকানের কোন অংশে তিনি কোন বই রাখবেন, কোথায় কোন কোন ম্যাগাজিন ঝোলাবেন। কেমনভাবে। ভাবতে হয়। খুব করে ভাবতে হয়। কোন গোপন অংশে রাখবেন এমন কিছু, যাতে পাঠক মুগ্ধ হয়। ক্রেতা হয়।

দুনিয়া দেখা হয়নি, জানবার প্রবল আগ্রহ আর অবাক চোখে বিশ্বাস করে নেওয়াই যেন টেনে নিয়ে এসেছিল। খবরের কাগজের দ্বিতীয় পাতার নীচের দিকে ছোটো তিনটে, ছ-টা, আট-টা ছবিতে চোখ আটকে থাকত। অপেক্ষা থাকত পরের দিনের। এই ভাবেই অ্যাসটেরিক্স, অরণ্যদেবের জন্য চোখ থাকত পত্রিকার পাতায়। হাতখরচ, টুকটাক বই-পত্রিকা কেনার জন্য নীচু ক্লাসের টিউশনি ছিল কয়েকটা। সামান্য মাহিনা। অনেক সময় সেটা পেতেও চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে চেয়ে নিতে হয়েছে। আবার আমাকে জানা অভিভাবক, নিজেই মাসের আগেই সম্মানদক্ষিণা দিয়ে দিয়েছেন। জুটিয়ে দিয়েছেন আরও কয়েকটা নতুন টিউশনি। মনে আছে, 'সুভাষ ঘরে ফেরে নাই' কিনেছিলাম দমদম কুমার আশুতোষ (ব্রাঞ্চ) স্কুলের বিপরীত দিকের একটা বইয়ের দোকান থেকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, শঙ্খ ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, তারাপদ রায়ের কবিতার বইও কিনেছি এখান থেকে। 'পথের পাঁচালী' কিনেছিলাম চাকদহ রেল স্টেশনের একটি দোকান থেকে। একটা বইয়ের প্রচ্ছদ আমাকে ভীষণ টেনেছিল, হাতে বন্দুক নিয়ে পুরোনো ভাঙা একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন একটি লোক। ফোটোগ্রাফে করা সেই প্রচ্ছদ। 'পথের দাবী'।

কেউ বারণ করবে না, পড়তে পারব অনেক নতুন নতুন বই আর পত্রপত্রিকা, এই লোভে চলে গিয়েছিলাম বাল্যবন্ধু কাজলের বইয়ের দোকানে। শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনের 'হুইলার' স্টলে। ঘুরে

গেল জীবনের মোড়। নেশার মতো হয়ে গেল, যাতায়াত চলতে লাগল নিয়মিত। আমি মূলত অ্যাসটেরিক্স আর টিনটিনের লোভে ওর কাছে যেতাম। স্টকে থাকা বইগুলির মধ্যে থেকে একটা একটা করে পড়ে ফেলতাম। যেটা থাকত না, বলতাম 'এনে রাখিস'। সেই লোভে আবার আগামী দিন যেতাম। এইভাবে বন্ধু কাজল টুকটাক কাজে অন্য কোথাও গেলে দোকান সামলাতাম আমি। কঠিন কিছু ছিল না, দামে দামে বই বিক্রি হয় 'হুইলার'-এর স্টলে। শুধু টাকা-পয়সা বুঝে নেওয়া আর সেইমতো ফেরত দেওয়া।

এইভাবে চলছিল। নতুন নতুন বই আর কত কত ম্যাগাজিন। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি। প্রলোভন আর প্রলোভন।

আমার এমন আগ্রহ দেখে একদিন কাজল বলল, 'একটা দোকান খালি আছে। নিবি নাকি?'

বললাম, 'কোথায়?'

'নর্থে। তিন আর চার নম্বরের মাঝে।'

একটু দোনামোনাই লাগল। তবু কেন জানি না, বলে ফেললাম, 'নেব।'

পকেটে তো টাকা-পয়সা থাকত না, হেঁটে হেঁটেই চলে যেতাম কোথায় কোথায়। ভাবলাম বই পড়ার সাথে সাথে যখন টাকাও আসবে কিছু, তা হলে আর না করি কেন!

কাজলকে সাথে নিয়ে পৌঁছে গেলাম ছোড়দা, বড়দার কাছে। বাঙালি ব্যানার্জিবাবু। তখনকার 'হুইলার'-এর শিয়ালদহ স্টেশনের চার্জে ছিলেন।

ছাপানো কয়েক পাতা কাগজে সই করে স্টলের চাবি সংগ্রহ করলাম। কিছু নির্দেশিকা মৌখিক শুনলাম।

আগেই দেখা ছিল, জানা ছিল না এত হাল-হকিকত। বন্ধ একটা স্টল দিনের পর দিন। বন্ধই থাকে। এ এসে নেয়, ও এসে নেয়। লসে রান করে, তারপর অন্য কোথাও পালিয়ে যায় তারা। পরীক্ষা যেন আমার! পারবে তুমি? প্রশ্ন করে যেন কেউ। আমার দু-চোখে স্বপ্ন। কত কিছু পারি আমি। অবশ্যই পারব।

ধুলো ঝাড়ি, ঝুল ঝাড়ি, চকমকে করে তুলি কাচ।

নিজের মধ্যে একটা লড়াই শুরু হল। জেদ, ধৈর্য্য রপ্ত করে নিতে হল। তাজা বাতাস বুকে ভরে ছুটে এলাম। কাগজে লেখা ছিল ৮% কমিশনের কথা। আমার লাভ।

কয়েকটা ম্যাগাজিন আর কিছু বই। ওই স্টলটাকে সাজানোর মতো করে, সামান্য কিছু নিয়েই শুরু হল আমার বই-বিক্রেতার জীবন। প্রথম দিনের রোজগার তাই ভুলতে পারিনি কোনোদিন।

স্টলের সামনের দিকে একটা এক ফুট চওড়া আর পাঁচ ফুট লম্বা কাঠের পাটাতন ঝোলানো থাকত লোহার আঙটা দিয়ে। শক্তপোক্ত। একদম পাঠক ক্রেতার নাগালে। আমার বড়ো পছন্দের জায়গা মনে হল এটি। 'হুইলার' অফিস থেকে আসা প্রথম দিনের চালান থেকে ম্যাগাজিনগুলোকে সাজিয়ে দিই এই ডানার উপর পাশাপাশি। বাংলা উপন্যাস, মোটিভেশনের বই, ছোটোদের বই, ইংরেজি নভেল, হিন্দি ডাইজেস্টগুলোকে কাচের দিকে রাখি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। খুবই সাদামাটা। বসি কাঠের টুলে। মাথার উপরে ঘোরে ভীমের গদার মতো সিলিং ফ্যান। কোনো আওয়াজ করে না। কেবল ঘুরে যায়।

সামনে তাকিয়ে অবাক হয়েছিলাম সেদিন। পুরো স্টেশন যেন আমার চোখের নাগালে। ট্রেন থেকে নামা মানুষজন, কুলি, হকার। ছুটতে ছুটতে ট্রেন ধরা যাত্রী। টিকিট চেকার। সব আমার চোখের নাগালে। যেন শিয়ালদহ স্টেশনটা আমার।

কেমন ছিল প্রথম দিনের কাজ? বেচা-কেনা?

সত্যি বলতে এই পেশার প্রথম দিন আজও আমার কাটেনি। যে-মুগ্ধতায়, আগ্রহে বসেছিলাম কাঠের টুলটায় সেদিন, আজও সেই মুগ্ধতা, আগ্রহ যায়নি আমার। আলোর মাঝে আলো হয়ে বসেছি। ভালো লাগা কাজ, মনের মতো করে করার সুযোগ এলে সেই কাজ করতে মন চায়। বই খুঁজতে এই মনগুলোই আসে। ক্রেতার বেশে। সখ্য করি। সাহায্য করি হাতে তুলে দিতে বই। দোকানে আসা প্রতিটি মানুষেই যেন নিজেকে খুঁজি। স্টেশন চত্বরে মূলত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক আর মাসিক বিভিন্ন ম্যাগাজিনের অনবরত খোঁজ হয়। সেই তুলনায় বড়ো বইয়ের খোঁজ কিছুটা কম। আমি শুধু সামনে তাকিয়ে থাকি। অগুনতি মানুষজন ট্রেনে উঠছে আর নামছে। দৌড়ে আসে কেউ অথবা ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা দুই-একজন আসে মাঝে মাঝে। কেনে। চলে যায়।

বাকি সময় সামনে তাকিয়ে থাকি। ওলটাই সাপ্তাহিক অথবা মাসিক ম্যাগাজিনের পাতা। এক জায়গা থেকে নেওয়া বই রাখি আরেক জায়গায়। নাড়াচাড়া করি। আবার রেখে দিই। এইভাবে সারাদিন, রাতের কিছু সময়। কাঠের ক্যাশ-বাক্সে খুচরো আর নোট রাখবার আলাদা জায়গা। চওড়া ধাতুর ক্লিপ, কোনোটা আবার প্লাস্টিক। বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিকের নাম লেখা তাতে। গেঁথে রাখি ম্যাগাজিন একটার সাথে আরেকটা।

রাত আটটা কী ন-টা। মনে নাই ঠিক। গুনি খুচরো, গুনি টাকা। তিনশো টাকায় শেষ। রোজগার তাই চব্বিশ টাকা। আনন্দ অবশেষ। মাথায় ঠেকাই এই ধন আমার। করি বন্ধ আলো-পাখা।

এক এক করে নয়টি পাল্লা। আওয়াজ খটাখট।

লোভ জাগে। নেশা পায় যেন। রোজই নতুন নতুন মানুষের সাথে আলাপ হয়। কত ভালো লাগা, একই মত। মিলে যায় বারবার। দ্রুত, খুব দ্রুত, বারবার, প্রতিনিয়ত দেখা হয় তখন আমাদের। পাঠক ক্রেতার চাহিদা বুঝতে চাই।

স্টেশনের সবচেয়ে দামি জায়গা ছিল আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম। তার ঠিক সামনেই ছিল 'হুইলার' অফিস ও মেন স্টল। দূর থেকে সাদা বেলুনের মতো বড়দার টাক মাথা দেখা যেত। ফর্সা ধবধবে শরীরের বড়দা ছিলেন শান্ত, কোমল স্বভাবের মানুষ। ভরসা পেতাম।

নতুন নতুন বই। আরও বেশি বেশি ম্যাগাজিন নিতে থাকলাম। দোকানও তেমন ভরাট হয়ে উঠল। ফাঁকা, অযথাই হয়তো-বা রাখতে হয়েছিল, ভরাট করতে শূন্যস্থান। এমন স্থানে রাখি উচিত বই। ম্যাগাজিনগুলোকে সাজাই যতটা বেশি সম্ভব সকলেই যেখানে দেখতে পাবে এমন স্থানে। দেখার মতো করে রাখি বিষয়।

তাড়া নাই। জগৎ দেখতে চায়। দেখতে চায় দুনিয়া এমন মানুষের অভাব নাই। কল্পনা তার সহজাত।

দাঁড়ায় এসে। ইতিউতি চায় এদিক-সেদিক। খুবই আলতো আর অজানা এক সাহসে ওলটায় বই, ম্যাগাজিনের পাতা।

আমি দেখি। প্রশ্রয় দিই...

পাঠকের আশ্রয়-প্রশ্রয় যারা

শিশির রায়

একটা ভিনদেশি প্রবাদে পড়েছিলাম— আর সব কিছুই মানুষ ভুলে যায়, ভুলে যেতে পারে, কিন্তু যেখানে, যে-মানুষটার কাছে সে ভালো ব্যবহার পেয়েছে, তাঁকে ভোলে না কখনো। আজ পিছন ফিরে দেখি, ভালো মানুষ আর ভালো ব্যবহারের 'স্মৃতি'র সঙ্গে আমার জীবনে কোথায় যেন 'ভালো বই'ও গেছে জুড়ে। বা, কথাটা এভাবে বলা যায় : ভালো বই খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি ভালো মানুষ আর ভালো ব্যবহারের পরশপাথর।

আর সেই বইগুলো মূলত ছিল ইংরেজি বই, জায়গাগুলো ছিল কলকাতা শহরের ইংরেজি বই-দোকান, মানুষগুলো ছিলেন সেই বিপণির কর্ণধার আর কর্মী দুই-ই, এবং এমনকী বই-দোকানে ঠিক সেদিন সেই সময়ে আসা অচেনা আগন্তুক পাঠক-ক্রেতাও ! বই কিনতে গিয়ে বই ও বন্ধু দুই-ই পেয়েছি, এমনও হয়েছে।

এত 'ইংরিজি'পনার কী আছে, এত দূর অব্দি এসেই কেউ বলতে পারেন ভুরু কুঁচকে। শহর জুড়ে বই-দোকানের অভাব নেই, বিশেষত কলেজ স্ট্রিট তথা বইপাড়ায় রোজ কয়েক হাজার মানুষের পা পড়ে, ছোটো ছোটো বই-গুমটি থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো বুকসেলার আর প্রকাশকেরও আস্তানাগুলো, যেখানে পাঠ্যবই, কম্পিউটারের বই, কম্পিটিটিভ পরীক্ষার বই, পুরোনো বই এবং অবশ্যই এসবের বাইরে সাহিত্য ও না-সাহিত্যের বইয়ের মায়াময় এক জগৎ অপেক্ষা করে আছে বাংলাভাষাকে আঁকড়ে, সেখানে কি পাঠক-ক্রেতা সুন্দর মুখ ও মনের পরিচয় পাচ্ছেন না ? মুখঝামটা খাচ্ছেন ? বাংলা-ইংরিজি বই ও বই-দোকানের এই ভাগাভাগি কি আসলে আমাদের সমাজমনের গভীরে লুকোনো ভাষাকেন্দ্রিক হীনতার বোধেরই বহিঃপ্রকাশ নয় ?

খানিকটা যে তা-ই, অস্বীকারের উপায় নেই। বই বই-ই, বইয়ের আলোচনা সর্বদা হওয়া দরকার ভাষাভেদরহিত। বই-দোকানের আলোচনাও হয়তো-বা। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্য একটা দিক থেকে ভেবে দেখতে বলি : এই একুশ শতকেও, প্রযুক্তি ও জীবনের মান ক্রমোন্নত করে তোলার বিপুল এই আয়োজনের সময়েও এই কলকাতা শহরে ইংরেজি বইয়ের দোকান তেমন নেই। ছোটোবেলার মতো আঙুলের কর গুনে হিসেব করলে বুড়ো আঙুলের মাথা কদ্দূর পৌঁছোবে সন্দেহ। উপরন্তু মাঝে মাঝেই ফেসবুকে মনখারাপিয়া খবর ভেসে আসে, অমুক বই-দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল, তমুক দোকানে বই কম অন্য জিনিস বেশি। সে বিপণিদের কোনোটা দার্জিলিঙে, কোনোটা শিলঙে, কোনোটা খাস রাজধানী দিল্লিতে। একটা বই-দোকান ঝাঁপ ফেলা মানে স্রেফ একটা 'আছে' জিনিসের 'নেই' হয়ে যাওয়া নয়, তার প্রতিটি বইয়ের অনস্তিত্ব আসলে এক জানা অজানা কম-জানা বিশ্বের এক-একটা জানালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শামিল, গোটা শহরের মন-মানচিত্রে একটা অপূরণীয় ছিদ্র— শহর এখনও এভাবে ভাবতে শেখেনি। শহরের শাসকেরা তো কদাপি নয়ই, এমনকী শহরবাসীও নন। প্রচারমাধ্যমে এক চিলতে খবর, সমাজমাধ্যমে বইপ্রেমী পাঠকদের দু-দিনের হায়-হায় পেরিয়ে এক-একটি বই-দোকান বিস্মৃতির খাতায় নাম লেখায়।

মিলান কুন্দেরার লেখা, শ্লোকের মতো সেই কথাটি মনে পড়ে : ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম আসলে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির লড়াই। যারা আর শরীরী অস্তিত্বে নেই, নিরন্তর স্মরণে তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায়, বাঁচিয়ে রাখাটাই আসল কাজ। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য এ-কথা, সমান সত্য শহর থেকে মুছে যাওয়া বই-দোকানের ক্ষেত্রেও। সিনেমা হলের, রাস্তার বা রাস্তার নামের, প্রাচীন পুরোনো ফলক

কার্নিশ রোয়াক গাড়িবারান্দা ঝুলবারান্দা বাজার মন্দিরভাস্কর্য সব কিছুর ক্ষেত্রে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় একদা ছিল অনেক বই-দোকান, স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ের পাঠ্যবই বা মানে-বই, কিংবা পড়শিবাড়িতে জন্মদিন-পৈতে-বিয়ের মতো শুভ অনুষ্ঠানে একখানা 'গীতবিতান', 'সঞ্চয়িতা' বা 'দেশে বিদেশে', কিংবা উপেন্দ্রকিশোর সুকুমার রায় লীলা মজুমদার উপহার দিতে উন্মুখ বাবা-কাকা-পিসেরা যেখান থেকে বই কিনতেন, বইয়ের বরাত দিতেন নিয়মিত, বছরভর। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে, বাজার অর্থনীতি, 'ইংলিশ মিডিয়াম', তথ্যপ্রযুক্তি ও আন্তর্জালের রবরবায় কখন যে আস্ত 'পাড়া-সংস্কৃতি'টাই বদলে গেল, পাড়ার বাঙালিয়ানার জলহাওয়ায় শ্বাস নেওয়া বই-দোকানেরা হয় মুছে গেল কিংবা খাতা-কলম, সস্তা চীনে খেলনা আর ফোটোকপি মেশিন-প্রিন্টারের কেজো দোকান হয়ে উঠল, আমরা খেয়াল করিনি।

এই দোকানগুলো, বলা বাহুল্য, বই রাখত পাড়ার পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী। যে যেমন চান, বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত জিকে গাইডবই টেন-ইয়ার্স, সব থাকত গায়ে গায়ে, বেঁধে বেঁধে। এর বাইরে পাঠকের যে বৃহত্তর, সূক্ষ্মতর চাহিদা, তা মেটাত শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সেই বই-দোকানগুলো, যাদের আমরা 'বুক স্টোর' বা 'বুকসেলার' বলি, বলতাম। শহর কলকাতায় বসে কেউ যদি হোর্হে লুইস বোর্হেস, ইতালো ক্যালভিনো বা টোনি মরিসনের চৌম্বকপ্রভাবে হারিয়ে যেতে চাইতেন স্বেচ্ছায়, তা হলে যেতে হবে সেই ইংরেজি বুক স্টোরে। সে এক অন্য জগৎ : থাকে থাকে, তাকে তাকে সেখানে স্থির হয়ে আছে বিশ্বসাহিত্যের মণিমাণিক্য।

তখন এম এ ক্লাসে। ইউরোপের ধ্রুপদি সাহিত্য আর মিল্টনের মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর পাতায় পাতায় আবিষ্কার করছি মিথ বাস্তব অধিবাস্তবের এক অনির্দেশ্য জগৎ, আবার ক-দিন পরেই টি এস এলিয়ট আর জেমস জয়েস নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছেন বিশ শতকের সাহিত্য-আধুনিকতার ধাঁধায়। এমনই এক দিন ক্লাসের শেষে দুরুদুরু বুকে আর গুটিগুটি পায়ে হাজির হলাম— প্রেসিডেন্সির উলটো দিকে 'দাশগুপ্ত'-তে। আগে যাইনি কোনোদিন, তবে ইউনিভার্সিটির সহপাঠী আর ফেলে-আসা কলেজের মাস্টারমশাইদের কাছেও শুনেছি, এ স্রেফ বই-দোকান নয়, এ হল 'প্যান্থিয়ন'প্রতিম। 'ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি'-ও বলা যেত, তবে ও-জায়গাটার সঙ্গে সমাধির শীতলতা জড়িয়ে কিনা, তাই'প্যান্থিয়ন'ই ভালো— রোমক দেবগৃহ। দেবতারা এখানে বইরূপেণ সংস্থিত। ফুটপাথ থেকে দু-তিন ধাপ উঠেই তুমি দেবতাদের এক্কেবারে সামনে। ডান দিকে তাকাও, বাঁ-দিকে তাকাও, ঘাড় উঁচিয়ে কি বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক দেখো, বই শুধু। আর কী সব বই! পাশাপাশি লেপটে আছে, তাদের লিকলিকে কি অ্যায়সা মোটা 'স্পাইন'গুলো কী মসৃণ, যেন এইমাত্র কেউ আগাপাশতলা নরম তোয়ালের আদরে মুছে তাদের ঢুকিয়ে রেখেছে আলমারির উষ্ণতায়। কী তাদের জেল্লা, কাচের মধ্যে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। দেবতা সামনে এসে দাঁড়ালে যেমন কথা চলে না আর, আমারও সেই দশা। সামনে, কাউন্টারের ওপারে কাঠের চেয়ারে বসে থাকা ছোট্টখাট্টো মানুষটি, চশমা-পরা, সৌম্যমূর্তি— যখন বললেন 'কী বই দরকার?', আমার মুখে কুলুপ। আমি শুধু এটুকু জানি যে আমার এলিয়টের নাটক নিয়ে কোনো বই দরকার, কোন বই তা তো জানি না! যতদূর চোখ যায় শুধু বই আর বই দেখে আমি তখন দিশেহারা আত্মহারা, বাক্‌স্ফূর্তি হলে কোনোমতে বলা গেল, 'এলিয়ট, এলিয়ট।' ও-প্রান্ত তখন শান্তগলায়, 'জর্জ এলিয়ট, না টি এস?'

এবার আমার সম্বিৎ ফিরেছে। তার কারণ অন্যতর : উরিব্বাস, ইনি জর্জ এলিয়ট টি এস এলিয়ট দু-জনকেই জানেন? এতদিনের অভিজ্ঞতা ছিল অন্য রকম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সেন্ট্রাল লাইব্রেরির কথা আলাদা, ওই মহাসমুদ্রে কে-বা কাকে চেনার অপেক্ষা রাখে, প্রতিটি বইয়ের পরিচয়জ্ঞাপক

খুদে খুদে নম্বরগুলোই যথেষ্ট, গ্রন্থাগারিক বা অন্য কর্মীদের জ্ঞানগম্যির প্রকাশ্য পরিচয় আমাদের জানার উপায় ছিল না। পাড়ার দোকান জর্জ কি টি এস কাউকেই চেনে না, সাহেবি নাম শুনলেই বলে কাগজে লিখে দাও, কলেজ স্ট্রিটে বলে দেখব (সঙ্গে যুগপৎ হতাশা আর অবজ্ঞা মেশানো সুরে : 'তবে ইংরেজি বই তো, ওসব পাওয়া মুশকিল')। আর এই বই-দোকানের মানুষটি দুই বন্দিত লেখককে যে শুধু জানেন তা-ই নয়, ধৈর্য স্থৈর্য বজায় রেখে, মুখের কোণে আন্তরিক হাসির রেখাটি এক বারের তরেও না মুছে, কাউন্টারে অপেক্ষমাণ অন্য ক্রেতাদের সঙ্গে দোকানের অন্য কর্মী দু-একজনকে সেঁটে দিয়ে, পড়লেন এলিয়ট এবং আমাকে নিয়ে। কোন জাদুমন্ত্রে মুহূর্তেই সামনে হাজির হল খান তিন-চার বই, সেই প্রকাশকদের জীবনে নাম শুনিনি, শুনিনি বইয়ের লেখক বা সম্পাদকের নামও, অথচ আমারই বিশ্ববিদ্যালয় আমার ক্লাসরুম থেকে ঢিল-ছোড়া দূরত্বে এঁরা বিরাজ করছেন 'দাশগুপ্ত'-র সযত্ন আতিথ্যে!

দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং-এর সঙ্গে সহযাত্রার সে-ই শুরু। তখন কি আর জানি এ বই-দোকানটির ইতিহাস? উনিশ শতক শেষ হওয়ার বছরকয় আগে প্রতিষ্ঠা এবং অদ্যাবধি তা বিরল এক রেকর্ড বজায় রেখেছে, তার পারিবারিক মালিকানা বদলায়নি আজ পর্যন্ত কখনো। অরবিন্দবাবু— সেদিনের সেই পথ না-চেনা তরুণটিকে হাত ধরে নিয়ে চলার কাজটি করেছিলেন যিনি— আজ সত্তর-অতিক্রান্ত, এখন দৌড়ে চলা জীবনে দেখাও হয় না তত ওঁর সঙ্গে। কিন্তু জানি নিশ্চিতভাবেই, এখনও কোনো দিন বিকেলে দোকানের সামনে ওই ধাপগুলোয় গিয়ে দাঁড়ালে দেখব আজকের কোনো মুখচোরা তরুণ কিংবা সপ্রতিভ তরুণীকে নতুন অচেনা বইয়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন— একই দক্ষতায়, ঋজু মৃদুতায়। ভালো বই আর ভালো 'বইওলা'র এই সহাবস্থান অব্যাহত আজও। শুনেছি উপরতলার বড়ো একটা অংশে লাইব্রেরি হয়েছে, ছাত্রছাত্রী থেকে আগ্রহী পাঠক সেখানে বই পড়তে পারেন নিশ্চিন্তে, এমনকী বিনি পয়সায়। গিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি এখনও, তবে সে যে চমৎকার একটা ব্যাপার হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অদূরেই আছে 'ন্যাশনাল বুক স্টোর', সেখানেও বইয়ের সম্ভার কম নয়, তবে কাউন্টারে এত হইহল্লা (বই ঘিরেই) আর ভিড় লেগে থাকত যে বই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ তেমন মিলত না, জানি না এখন কেমন সেই বই-দোকানের চাহিদা।

আমাদের ছাত্রজীবনে এসপ্ল্যানেড-ধর্মতলা অঞ্চল ঘোরার সময় ছিল বিস্তর, পকেটে রেস্ত না থাকলেই বা। গ্র্যান্ড হোটেলের ফুটপাথ থেকে যে তরুণ একশো টাকার টি-শার্ট বা হাতঘড়ি কেনেনি জীবনে, সে কি কলকাতাকে চিনেছে আদৌ? ক-বন্ধু মিলে ঘুরছি-ফিরছি ওই ফুটপাথেই, কাটিয়ে দিচ্ছি একটা গোটা দুপুর বা সন্ধে, এমনও হয়েছে কত বার। এবং কোনো বারই 'মিস' হয়নি চিলতে বই-দোকানখানি— 'ফরেন পাবলিশিং এজেন্সি' যার নাম। সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা আর সাহিত্য-ঘেঁষা বইয়ে যদি দাশগুপ্ত-র মনসবদারি, এ-দোকানের তবে সমাজতত্ত্ব, চলচ্চিত্রবিদ্যা, ফ্যাশন, আরও কত কী খটোমটো বিষয়ও, যাদের আমরা একবাক্যে 'টেকনিক্যাল' বলে সেরে দিই। চৌরঙ্গি রোডের ওই তুমুল জীবনমুখী কেরদানির মধ্যে ছোট্ট বই-দোকানখানা আস্ত এক ব্যতিক্রম, চূড়ান্ত ভোগবাদের মধ্যে যেন কে এসে বসিয়ে দিয়ে গেছে শান্ত বোধিবৃক্ষ এক। কোনো দিন বই কিনিনি, ওসব বই কেনার সামর্থ্য ছিল না তখন। তবে ওই, চোখের দেখাতেই যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ডের নামটি চ্যানেল না শ্যানেল সে-নিয়ে আমাদের প্রায় হাতাহাতির উপক্রম দোকানের সামনে, ফ্যাশন নিয়েও যে অমন বই হতে পারে সে-কথা ফিরতি পথে ভেবেছি অবাক হয়ে। এখানেই দেখেছি গ্রামশির বইয়ের পাশে আর্কিটেকচারের চোখ-জুড়োনো ছবিওলা বই, এরিক হবস্‌বমের বইয়ের গালে গাল ঠেকিয়ে কোন এক রুশ কি বেলারুশি সুন্দরী অ্যাথলিটের জীবনকৃতিকথা, নামটি তাঁর মনে নেই আজ।

সিগাল বুকস এই সেদিন বার করল নতুন বই, মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ-উদ্‌যাপন আবহে ওঁর পুত্র কুণাল সেনের চমৎকার ইংরিজি স্মৃতিগ্রন্থ 'বন্ধু'। এক বন্ধু বইটি উপহার দিলেন বলে তাই, নয়তো এ-বই কিনতে মন করছিল খাস বিপণিতে গিয়েই— কেননা ইংরেজি বইপ্রেমী কে না জানেন, সিগাল বুকস-এ বইযাপন এক 'অভিজ্ঞতা'। আন্তর্জালে অলস সময়ধারা বেয়ে মাঝে মাঝে যখন ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের দূর কোণে ছোট্ট একক একাকী কোনো বই-দোকানের ছবি আর গল্পেরা উঁকি দিয়ে যায় আর দেখামাত্র মনে হয় ইস, এক বার কি এমন একটি বিপণিতে বসে কি দাঁড়িয়ে প্রিয় বইয়ের পাতা ওলটাতে পারব না— সেই আক্ষেপ আমি বহু বার বহু সময় মিটিয়েছি সিগাল-এ গিয়ে। একটা কলকাতার মধ্যে এ যেন আর একটা কলকাতা— হাজরা-ভবানীপুরের হাড়েমজ্জায় পুরোনো 'কলকাত্তাইয়ানেস'-এর (যদি দুঃসাহস করে এমন একখান শব্দ বানানো যায়) মধ্যে এক টুকরো শিল্পিত স্নিগ্ধতা। এ-দোকানের অবস্থান যে-পাড়ায় তার তারে তারে এখনও সেকেলে ধ্রুপদি কলকাতা-জীবনের মিড়, তারই মাঝে বিপণিটির সুস্মিত অধিষ্ঠান প্রবেশপথের মূর্তি-ভাস্কর্যের উপস্থিতিতে, দেওয়ালের ফোটোগ্রাফ আর ছবির নান্দনিক 'ব্যালান্স'-এ যে গোড়াতেই মন জয় করে নেবে বই দেখতে বা কিনতে আসা মানুষটির। এ তো কেবল বুকস্টোর নয়, প্রকাশনাও— তারই উচ্চরুচির পরিচয় সর্বাঙ্গে। বইগুলিও এক-একটি আবিষ্কারবিশেষ, চোখ-খুলে-দেওয়া : রোমিলা থাপারের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিময় বই যেমন আছে, তেমনই বোর্হেসের সঙ্গে কথালাপের বই ইংরেজি অনুবাদে। সোমনাথ হোরের 'তেভাগা'র ইংরেজি অবতারটিকে যদি আপনি দেখে ফেলেন, কিংবা অবাঙালি কি প্রবাসী প্রিয় বন্ধুটিকে পড়াবেন বলে অপেক্ষা করে করে মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাস বা বাদল সরকারের নাটক পেয়ে যান ইংরেজি অনুবাদে, সে-ই তো আপনার অমোঘ ইউরেকা-মুহূর্ত, নয়? শুনেছি প্রকাশনার উপরে ওঁদের নিজস্ব পাঠক্রমটির কথাও, এ-শহরে আর ক-টি অসরকারি প্রকাশনা বা প্রতিষ্ঠানের তেমনটি আছে আর?

আর আছে পার্ক স্ট্রিটের প্রায়-মোড়েই বাহরি সনস— দিল্লির প্রিয় বই-বিপণিটি কিছু দিন হল পা রেখেছে আনন্দনগরী কলকাতায়। উলটো দিকেই পার্ক হোটেলের তলায় অক্সফোর্ড বুক স্টোর, একটু বেশিই সাজানো-গোছানো যেন, যেমন থাকে আজকাল কর্পোরেট-সংস্কৃতি পদে পদে মেনে চলা যেকোনো প্রতিষ্ঠান। বাহরি সনস-এ ঢুকলে কিন্তু ও-কথা মনে হবে না— বিশেষ করে দোতলায়, যেখানে ওদের বই-সম্ভার প্রধানত, সে-জায়গাটা দেখলে। রাজনীতি অর্থনীতি সমাজবিদ্যা সাহিত্য দর্শন পপুলার কালচার এটা-ওটা... বইয়েরা আছে এক-একটা বিষয়সূত্র ধরে গোছানোই, কিন্তু সেই গোছানোতে কৃত্রিমতা নেই। বরং একটু অগোছালো, একটু আলগা ভাব— যেমন থাকে জীবনে। আর এ-কারণেই এ-দোকানে বই ঘেঁটে খুঁজে হাতে নিয়ে দেখতে কী যে ভালো লাগে! আপনার চোখ আর হাতের আঙুল সরে সরে যাচ্ছে একটা তাক থেকে আর এক তাকে, এখান থেকে ওখানে, আপনি খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না, কিংবা পেয়ে যাচ্ছেন তবু খুঁজছেন আরও কিছু, আর একটু বেশি বা অন্য রকম কিছু বই ঘিরে এই গোটা 'খেলা'টার মধ্যে যে আশ্চর্য রহস্য-রোমাঞ্চ, এই বই-দোকানে তা মেলে ষোলো আনা। যে-দোকানে সব একেবারে গোছানো, লেবেল-সাঁটা, এখান থেকে ওই পর্যন্তই সাহিত্য, ওপাশ থেকে সে-ধার পর্যন্তই দর্শন— সে নিশ্চিতভাবেই চটজলদি সুবিধেজনক, কিন্তু বই খোঁজার আনন্দটা ওতে মাটি হয়ে যায় একেবারে। বইয়ের একটা মানুষী, মানবিক সত্তা আছে। একা বা সবন্ধু কোনো বই খুঁজছি আর নিজেদের মধ্যেই একটা ছেলেমানুষি খেলা খেলছি কে আগে বইটা খুঁজে পাব, এর মধ্যে যে নিহিত পুলক তা ওই লেবেল-সাঁটা পটের বিবি বই-দোকানেরা কি কস্মিনকালেও জোগাতে পারবে? বাহরি-তে সেই মানুষী, এবং ছেলেমানুষি মজাটার অংশী সবাই— কাউন্টারের মানুষটি থেকে

শুরু করে আপনি, আমি, দোতলায় যে সহায়ক কর্মীরা, তাঁরাও। এই আন্তরিকতাটাই তো বই-দোকানে গিয়ে মনে মনে চান পাঠক-ক্রেতারা; আশ্রয় ও প্রশ্রয় চান প্রিয় বই-দোকানটির কাছে, যেমন চায় মায়ের কাছে শিশু!

হাল আমলের কলকাতা 'স্টারমার্ক' বা 'স্টোরি'-তে মুগ্ধ, তারও সঙ্গত কারণ আছে অবশ্যই। বই ঘিরে যে রোম্যান্টিকতার পরোটা সাঁতলালাম এতক্ষণ, সবাই যে তার সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন বা করবেন তা তো নয়। একুশ শতকের জীবন রিলে রেসে দৌড়চ্ছে 'ইউটিলিটি'-র বেটন হাতে, তুমি কত কম সময়ে বা কত তাড়াতাড়ি আমার ইচ্ছে চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করতে পারছ, সেটাই দেখার। সেটাতেই পয়েন্ট, বা পয়েন্ট কাটা। একটা বিরাট ফ্লোর জুড়ে শুধু বই আর বই, সেখান থেকে মনের মতো-টি খুঁজে বার করার প্রয়োজনে আমি গোটা বইসমুদ্র অগোছালো করে রাখতে পারি না— তত্ত্বগতভাবেই। 'সিস্টেম' তা হতে দেবে না; সে চায় শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, স্থিতি। সে চাইবে বিরাট বই-বিপণি হোক, মাঝে মাঝেই থাকুক কম্পিউটার বা স্মার্ট স্ক্রিন যেখানে পাঠক-ক্রেতা নিজে থেকেই দেখে নিতে পারবেন প্রয়োজনীয় বইটি এই বিরাট দোকানে আছে কি না, এমনকী থাকলে কোথায় কোন কোণে তার হদিশও। এই বইজীবন নিশ্চয়তা, নির্ভরতা অর্থী; অনিশ্চয়তা-বিমুখ। গোলপার্ক-গড়িয়াহাটের ফুটপাথে বইয়ের পাঁজায় হঠাৎ পুরোনো বা প্রথম সংস্করণের একটি প্রিয় বই পেয়ে গিয়ে মনে হয়েছে যেন সাহিত্যে নোবেলটাই পেয়ে গেছি— এই আনন্দের বোধে 'সিস্টেম্যাটিক' বই-দোকানগুলো বিশ্বাসী নয়। তারা আনন্দ দেবে তবে সেও মেপেজুখে, দুয়ে-দুয়ে চার করে তবে। তবে টক ঝাল মিঠে কড়া তেতো এই সব মিলেই তো সংসার, বইবিশ্বেও বা তার অন্যথা হবে কেন। কলকাতাতেও সবাই থাকুক— বিচিত্রতায়, বৈপরীত্যে ভরে। তবে না এই শহরটারও মানমর্যাদা, ঐতিহ্য বজায় থাকবে!

‘আ বাও আ কু’র আফসানা

সায়ন্তন সেন

বুজুর্গে বলে, গোড়া থেকে বললে গপ্পো বুঝতে সুবিধে হয়। তাহলে গোড়ার থেকেই বলি।

আমাদের ছিল দরিদ্র ক্লাসঘর, তার চাকলা-ওঠা ব্ল্যাকবোর্ডে বাঁকা অক্ষরে লেখা রবার্ট ফ্রস্টের কাব্যতত্ত্বসার। গ্রন্থবিপণি, একটু টেনে ধরলে, বোধহয় বারো কি তেরোটা। তারপর একদিন, আমার দেখা সুন্দরতম পুরুষ, আমার ইংরেজির মাস্টারমশাই তলব করে বললেন— ‘পরের শনিবার ‘জর্জেস সিক্রেট কি টু দ্য ইউনিভার্স’ আর ‘অ্যানিম্যাল ফার্ম’ পড়ে এসো’।

আমার মাধ্যমিক তেরো সালে। এগারোর বিধানসভা নির্বাচনের আগে (অনেকের মনে থাকবে), অর্পিতা ঘোষের ‘পশু খামার’কে কেন্দ্র করে বাংলার বিদ্বৎসমাজে কিছুদিন চাপানউতোর চলেছিল। জয়দেব বসু তখন ক্রমশ পৃথুল, তবু ‘আজকাল’-এ এরিক আর্থার ব্লেয়ারকে ধুয়ে দিচ্ছেন। আমি তেরো বছর বয়সে প্রথম জর্জ অরওয়েলের নাম শুনেছি, তুলোও ধুনেছি, কিন্তু বইটা আর চোখে দেখা হয়ে ওঠেনি। অথচ আমার ইংরেজি সাহিত্যপ্রীতির খিদমতে ব্যাপার দাঁড়াল এরকম : এখন আমায় দুটি বই খুঁজে এনে পড়তে হবে। আমাদের এঁদো মফস্সলে একটা করে ‘বুক হাউস’ অথবা ‘বই ঘর’— ‘মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ’ তাতে ছিল না— ছিল ‘টেক্সট বই’-এর বাইরে প্রধানত দে’জ আর আনন্দ-র জনপ্রিয় বই, গাঙচিল, অনুষ্টুপ ও প্রতিভাস হাতেগোনা, ঠেসে গাদা রবীন্দ্র-শরৎ-বিভূতি-মানিকের সুলভ সংস্করণ, আর ইংরেজি যেটুকু, হয় তা পেঙ্গুইন অথবা রূপা। তখন অনেকটা সময় আমার বুক হাউসে কাটত। ব্রোকেন রিপাবলিক-এর দুধসাদা হার্ডবোর্ডে কেটে বসা পাখিটির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাই, আরও ডান দিকে গেলে ‘শ্যাডো লাইনস’, তার পাশে উইলিয়ম ডালরিম্পলের গোটা দুয়েক পুরুষ্টু ইতিহাস বই, আর, ওঁদের ছায়াঘন, ধূলিধূসরিত খাঁজে অরওয়েলের চটিখানাও যে উপ্ত ছিল সেটা মাধ্যমিক পাশ করে জানলাম। কিন্তু ‘জর্জের লুকোনো চাবি’র সন্ধান?— উঁহু, ‘হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে’। এখানে একটু ক্রোনোলজি আলোচনা করতে হবে। সময়টা লক্ষ করবেন, হুজুর। আমার মাধ্যমিক, অর্থাৎ দু-হাজার তেরো সাল, অর্থাৎ, অ্যামাজন.কম-এর বয়স তখন ১৯, ফ্লিপকার্টের ৬, আর স্ন্যাপডিলের ৩। কলকাতার কথা জানি না, বহরমপুরে দু-হাজার দশের আগে ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে আসেনি, ‘অনলাইন শপিং’নাম্নী কোনো বায়বীয় বিপণনপ্রথা তো নয়ই। সুতরাং, আমি হন্যে, ঈষৎ উদভ্রান্ত, এবং লজ্জার কথা কলেজ স্ট্রিটও চোখে দেখিনি। হাল ছেড়ে দেব কি না ভাবছি, এমন সময়, সদ্য আলাপে আমার এক প্রশস্তহৃদয় বন্ধু ঠিক ফেরেস্তার মতো (আজও সে আমার সখা) ‘স্ন্যাপডিল’-এ অর্ডার দিয়ে আনিয়ে দিল বইখানা। এল সে বই পোস্টাপিসে। দন্তপ্রক্ষালনের আগে যে ডেলিভারি পার্টনারেরা এখন কলিংবেল বাজায়, তাদের সংঘ তখনও তৈরি হয়নি। কলকাতায় কি তারা ছিল সেদিন? কে জানে (কে যেন বলেছিলেন, রাজধানীর প্রভাতী দৈনিক আমাদের মফস্সলে আছড়ে পড়ে সন্ধ্যায়?)! তখন স্ন্যাপডিল মানে আমার কাছে ডোরেমনের গুপ্ত পকেট, দূর-কোনো-সমুদ্রের-হঠাৎ-ঝাপট, এক বিকেলের ডাকে তার বুকমার্ক এল। ‘জর্জের লুকোনো চাবি’, তার গায়ে খোদাই মহাবিশ্বের ঠিকানা— সেই প্রথম, এবং প্রথম প্রণয়স্পর্শে আমি কমপ্লিট দিওয়ানা হয়ে গেলাম। সেই অভিসার আজও সমানে চলেছে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, প্রায় এক দশক কলকাতায় কাটিয়ে দেওয়ার পরেও আমি কলেজ স্ট্রিট যেতে শিয়ালদার কোথায় দাঁড়িয়ে অটো ধরতে হবে, বন্ধুদের ফোন করে জেনে নিই। গেছি তো কয়েকবার। একবার, বোধহয় কফি হাউসেও গেছি। কিন্তু কলকাতার পথে এত ধুলো, এত শব্দ, এত কৃমি— আমার

মনে পড়ে যাচ্ছে— 'আর ওই ধুলো, তা রাজস্থানের খটখটে মরুভূমির বালু নয়, তাতে বৈরাগীর গৈরিক রঙ নেই, তা কালীঘাটের কালীর নিশ্বাসে সিক্ত, কালো কাকের চেয়ে কালো, পাঁক নর্দমার মতো সর্দি। সকালে উঠে দাঁত মাজার পর নাক ঝেড়েছেন কখনো? আপনার নাক থেকে কলকাতা বেরোবে'[১]। যাক গে, এসব গুরুবাক্য, আমি পুনরুক্তি করছি মাত্র। যেহেতু আমি চৌবাচ্চার তেলাপিয়া, কলকাতায় বারবার চেনা রাস্তা ভুলে যাই, ক্রমে আমার ধৈর্য চটে যেতে থাকে, বন্ধুরা খোঁটা দেয়, 'তুমি শালা কমিউনিস্ট, আর লোকাল ট্রেনে চড়তে ভয় পাও?', কাজেই, বুঝতেই পারছেন, জ্ঞানলাভের উচ্চাশাটিও কালে কালে মিইয়ে যেতে থাকে। আর— হায় হাসি, হায় দেবদারু— কী কুক্ষণে 'কবীর সুমন একক'-ফেরত এক ক্ষীণাঙ্গী যুবতী আমায় আঘা শাহিদ আলির কবিতা পড়তে বলে। কাশ্মীরে তখন মাস ব্লাইন্ডিং চলছে। বুরহান ওয়ানির শাহাদাতের কিছুদিন পরে 'আ কান্ট্রি উইদাউট পোস্ট অফিস' আমাদের ঘরে এল, সঙ্গে আমার প্রথম দেখা গ্রাফিক নভেল— মালিক সাজাদের 'মুন্নু'। সেটা ষোলো সাল, যাদবপুরের ব্যাঙ্কপ্লটে একটা নীল ঘর ছিল আমাদের, সে-ঘরের শিরায় শিরায় ছিল যুগসঞ্চিত আলস্য, তার আগল ছিঁড়ে সেদিন আমার ঘুম ভাঙালেন ফ্লিপকার্টের ডাক হরকরা। আঘা শাহিদ আলির বেশ কিছু কবিতা সঙ্গে সঙ্গে তরজমা করে ফেললাম, আর কার্টে তুলে নিলাম 'কল মি ইসমাইল টুনাইট'। ব্যস, জ্ঞানলাভের উচ্চাশাটি ফের দ্বিগুণ উৎসাহে আমায় পেয়ে বসল। এবারে আর আলস্য তাকে কাবু করতে পারল না। দু-পা হাঁটলেই দরজা, আর হাতের মুঠোয় চাবি (পকেটে যা খুচরোখাচরা ছিল, তা দিয়ে অন্নজলের সংস্থান ঠিকই হয়ে যেত)!

বাকি কথা রসিকজন মাত্রেই বুঝবেন। তখন সদ্য কলেজে উঠেছি, নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য আয়ত্ত করছি। স্নিফার ডগের মতো সারাদিন সবজান্তা মামাদের পায়ে পায়ে ঘুরি, পশ্চিমে একটা কিছু ঘোটালা হয়েছে বা হচ্ছে শুনলেই খাতায় নামধাম টুকে নিই। সকলেই মহামনস্বী, 'মেন অব উইসডম', খোদ ঈশ্বরের নির্দেশে তাঁরা পালকি চড়েন, আর আমি রুগ্ন কোচোয়ান[২]। এই মতো জিজেক, আগাম্বেন, এবং আরও যাঁদের নাম আমি আর কখনো নেব না বলে মানত করেছি, সকলে আমার কার্টে জড়োসড়ো বিছানা পাতেন। মাইরি বলছি, এক লাইনও পড়িনি। একে ফেটিশ বলতে পারেন, আবার মৌতাতও, অথবা বলতে পারেন 'আর্ট অব সিডাকশন্'। মরুক গে, গল্প বলি। তখন একটু আধটু ক্লাস ক্যাম্পেইন করতাম, মূর্খে বলে রাজনীতি। ইতোমধ্যে আমাদের কানে এল, কিছুদিন আগেই না কি কেওয়ান করিমিকে দুশো তেইশ ঘা চাবুক মারার হুকুম করেছেন ইরানের আদালত। করিমির অপরাধ, 'অ্যাডভেঞ্চারস অব আ ম্যারেড কাপল'-এ তিনি গুটিকয় ম্যানিকুইন দেখিয়েছিলেন। দশ মিনিটের ছবিটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম। তারপর ইতালো ক্যালভিনোর গল্পখানাও খুঁজে বার করি, কিন্তু পড়ি না। কে না জানে, এসব লেখা পড়তে হয় তরিবত করে, দিনের প্রথম রোদে পৃষ্ঠা মেলে, শরীর এলিয়ে। আজকাল অনেকে বলেন কাগুজে বই পরিবেশের ক্ষতি করে। আমি তা মানি না। যেসব যন্ত্রে বই পড়া হয়, তাদের রসদও কি প্রকৃতিকে নিগ্রহ করেই সংগৃহীত হয় না? সুতরাং, আমার ডোরবেলটি আবারও বাজল, এবারে অ্যামাজনের দূত এসে হাতে দিয়ে গেলেন 'ডিফিকাল্ট লাভস' এবং কার্টে গচ্ছিত রইল 'ইফ অন আ উইন্টার্স নাইট আ ট্র্যাভেলার'। তারপর কত থানে কপাল ঠুকেছি, অথচ এ-বইটা আর কেনা হয়ে ওঠেনি। আবার কোনোদিন হয়তো ইতালো ক্যালভিনোর কাছে ফিরব। যদি ফেরা হয় (যেন হয় একদিন), তখন শুরু করব 'ইফ অন আ উইন্টার্স নাইট' দিয়ে।

এখন পিছন ফিরে দেখি, এই অন্তর্জাল বিপণন সংস্থাগুলোই পাশ্চাত্যের (এবং আফ্রিকার) মনীষার সঙ্গে আমার সান্নিধ্যের প্রধান সূত্র। যত বড়ো হয়েছি, জীবনকে তত্ত্ব দিয়ে বুঝতে চেয়েছি; নিপাতনে সিদ্ধ আমার ওয়ার্কিং বিবলিওগ্রাফি অজগরের মতো লম্বা হতে থেকেছে অ্যামাজনের কার্টে। বইয়ের সঙ্গে আজও আমার একটা সহজ ভালোবাসা আছে, সে আমার নিতান্ত দুষ্কর্মের সঙ্গী। বাংলা বই কিনি

বছরে একবার, বইমেলার সময়। পকেট ফাঁকা করেই কিনি। 'কলেজস্ট্রিট.নেট' আর 'রকমারি.কম'-এ হাত পাকিয়ে নিলে হয়তো বইমেলাটাও ছেড়ে দেব। তেরো থেকে তেইশ— দশ বছরে যত বই অনলাইনে কিনেছি তার একটা মোটামুটি তালিকা (আমার কোচোয়ানবাজির খতিয়ান) এখানে পেশ করলে মন্দ হত না। কিন্তু মানত করেছি— উঁহু, নাম নেব না। তাহলে অন্য কথা বলি। বুকে হাত রেখে বলুন তো, কলকাতার কোন দোকানে, কোন ফুটপাথে, কে আমায় খুঁজে দিত ডনা হ্যারাওয়ের 'সাইবর্গ ইশতিহার' (আট ফর্মার যে ছোট্ট বইটির ধাক্কায় অসংলগ্ন হয়ে আরও একবার আমি 'লুব্ধক' পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম)? কোথায় পেতাম জাক খঁসিয়ের 'ইতিহাসের মূর্তি' (একদিন তর্কে তর্কে ক্রুদ্ধ হয়ে যার দেহসন্ধি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম মাঝ বরাবর)? বড়ো হয়ে বুঝেছি, 'যাচ্ছেতাই' পড়াটাই পড়া। আর পড়া মানেই তো সম্ভাব্য ভাষান্তরের তাগিদ— 'যে-কথা বলিতে চাই, বলা হয় নাই'। সুতরাং, যা পড়ি, তার অনেকখানি তৎক্ষণাৎ তরজমাও করে ফেলি। এই করে হল আরও বিপদ। হাত মক্সো করতে করতে একদিন ফানৎজ ফানোর আস্ত একটা প্রবন্ধ বঙ্গানুবাদ করে ফেললাম। এখন আমার বই কেনার প্রধান উপলক্ষ্য প্রচুরতম তরজমা; আমার কোচোয়ানবাজির শেষতম আশ্রয়— পুনর্কথন।

মনে মনে কত যে ঘোঁট পাকাই, তার ইয়ত্তা নেই। সহস্র থেকে কয়েকটি চয়ন করি। না-হয় একটা বইয়ের নাম দেব 'আয় ঘুম— জাঁ-লুক ন্যান্সির গদ্যাংশ', ব্যাক কভারে লেখা হবে 'যতবার মানুষ ঘুমায়, পৃথিবীতে সংশয় পরাভূত হয়'; আরেকটি পুস্তিকা 'ইতিহাসের চার অর্থ'— 'অতীত ততদিন ইতিহাস, যতদিন অশ্রুতে, বেদনায়, অহংকারে সে আমাদের হাত ছুঁয়ে থাকে'— জাক খঁসিয়ে। একটা বইয়ে থাকবে আফ্রিকা মহাদেশের আবহমান কবিতা— সুঠাম, স্রোতস্বিনী; আরেকটিতে পাতায় পাতায় রঙিন জলছবি আঁকা 'আ বাও আ কু'র আফসানা[১]— আ বাও আ কু! চেনো তো তাকে? সেই যে 'আ বাও আ কু'টি— থলথলে, গদোগদো, চিতোরের সবচেয়ে লম্বা দুর্গের আঁধার সিঁড়িতে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে, আর সিঁড়ি দিয়ে কেউ ছাদের দিকে উঠে গেলেই যে সাথে সাথে পিছু নেয় তার, আর যত সে দুর্গ-দর্শনার্থীর পিছে পিছে উঠে যায় উপরের দিকে ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার অন্তর্গত আলো, তত তার গা থেকে ছড়াতে থাকে নীলাভসবুজ এক আশ্চর্য, আলৌকিক দ্যুতি— চোখে অক্ষম পিঁচুটি নিয়ে বিটকেল সব ইংরেজি অক্ষরের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি সেই আভা দেখি (চোখ বুজে), আর 'আ বাও আ কু'র কথা ভাবি। ভাবি, কার প্রাণ তার অন্নজল?

এসবই তো আঁতলামির অস্ত্রশস্ত্র। অস্ত্র ভালো পাইয়াছি, একটাই আক্ষেপ, দাম বড়ো চড়া। একে মাথার দাম, তায় ফরেন মাল, 'চকচকে কাগজে ঝকঝকে ছাপা'। মাসের মাঝখানে এসে দুটো পকেটই যখন ফুটো হয়ে যায়, মনে পড়ে, জন্মদিনের খুব দেরি নেই আর।

১. নামে কী আসে যায়? এ কথা তো কতবার আপনারও মনে হয়েছে।
২. জোসেফ অ্যাডিসনের 'আ ভিশন অবজাস্টিস'-এ 'ল্যাকিজ অবদ্য লার্নেড'দের কথা আপনি বিস্তারে পাবেন।
৩. এর গল্প কিন্তু হাজার খুঁজলেও সহস্র এক আরব্য রজনী-তে মিলবে না।

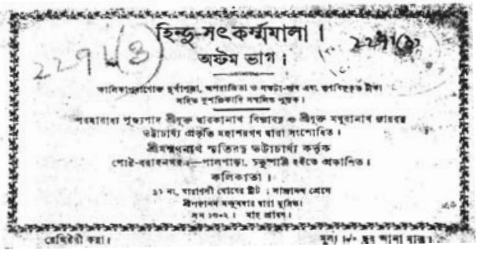
হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা।
অষ্টম ভাগ।

গওসিয়া লাইব্রেরিতে দেড় ঘণ্টা

পৃথ্বী বসু

শীতের দুপুর। নাখোদা মসজিদ হয়ে ঘুরপথে মেছুয়ার ফলপট্টিতে ঢুকতেই চোখে পড়ে অসংখ্য আপেল-বেদানা-কমলালেবু-আতা; পার করে এগিয়ে যাই। পেঁপে-কলার স্তূপের ডানদিক বাঁ-দিকে ছোটো-ছোটো গলতা। একটায় ঢুকি। ফুটের ওপরে এমনভাবে লুকিয়ে আছে সেই বইয়ের দোকান, চট করে চোখে পড়ে না। ঠিকানা— ৩০, মদনমোহন বর্মণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭। গওসিয়া লাইব্রেরি। ভেতরে বসে আছেন প্রায়-প্রৌঢ় মহম্মদ আশরাফুল আমিন এবং তাঁর ছেলে মহম্মদ আনাস আমিন। শুরু হয় গল্প...

'গওসিয়া লাইব্রেরি কে যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই ইতিহাস আজ আর বলার মতো কেউ নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, এই লাইব্রেরির জন্ম ১৮৯৯ সালে। তারপর ১৯৪৭ সাল নাগাদ সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরি এই দোকান কিনে নেয়। আসলে ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময়ে চিৎপুরে সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওদের দোকানটা ছিল সোনাগাছির কাছে। আশেপাশে আরও যা-যা বইয়ের দোকান ছিল— তারাচাঁদ অ্যান্ড সন্স, জেনারেল লাইব্রেরি ইত্যাদি— কোনোটাই নিজেদের শেষ অবধি বাঁচাতে পারেনি। দেশভাগের পর তাই সিদ্দিকিয়া-র মালিক হাজি আফাজুদ্দিন আহম্মদ চিৎপুর থেকে নাখোদার দিকে সরে আসেন। ওঁরা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ফলে সেই সূত্রে ওঁদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগ একটা ছিলই। আফাজুদ্দিনের মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন আহমেদ যখন এর দায়িত্বে এলেন, তখন অনেকে অনেক দাম দিয়ে এই জায়গাটা কিনতে চেয়েছিল। দেখছেনই তো, ফলে ঘেরা পৃথিবীর মধ্যে এই দোকানটা কীরকম বেমানান! কিন্তু নূরুদ্দীন চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠানটা জীবিত থাকুক। অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উনি এই জায়গাটা বাঁচিয়েছেন। চাচা চলে যান আশির শেষদিকে। ১৯৭০ থেকে আমি এই দোকানটায় আছি। পাশেই আমাদের দোকান ছিল, ইসলামিয়া লাইব্রেরি নামে। সেখানে শুধুই ইসলামিক বইপত্র পাওয়া যেত। চাচা চেয়েছিলেন আমিই যেন গওসিয়ার ভার নিই, সেই থেকে চলছে...' বলছিলেন আশরাফুল।

কী ধরনের বই ছাপা হত গওসিয়ায়? আশরাফুল জানান, 'সে-সময়ে জমিদারবাড়ি বা নানান বনেদি বাড়িতে পুঁথি পড়ার চল ছিল। বড়োদের মুখে শুনেছি, সন্ধেবেলায় না কি গোল হয়ে বসে প্রদীপের আলোয় পুঁথি পড়া হত। গওসিয়া মূলত এইসব পুঁথিসাহিত্য ছাপত। দেড়শো থেকে দু-শো রকমের পুঁথিসাহিত্যর বই ছিল তখন। প্রতিটি বই-ই রসে ভরপুর। মানুষ পাঠ করে আনন্দ পেত। সেখানে মানিক পীর-সত্য পীরের কাহিনি যেমন ছিল, তেমনই ছিল বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি। আর ছিল কেচ্ছার বই। নেক-বিবির কেচ্ছা, আলিফ-লায়লার কেচ্ছা, সখি-সোনার কেচ্ছা ইত্যাদি। এই বইগুলোর চাহিদাও ছিল বিরাট। কেচ্ছার বইগুলো আমরা এই দু-হাজারের গোড়ার দিকেও কিছু বিক্রি করেছি। এখন এসবের চাহিদা কমেছে, ফলে আর ছাপি না।'

কথার ফাঁকে-ফাঁকে হাতে উঠে এল মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত 'বোন বিবি জহুরা নামা', মুনসী আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী', মরহুম সেখ কমরুদ্দিন সাহেব প্রণীত 'খায়রল হাশার', মরহুম ছৈয়দ হামজা সাহেব প্রণীত 'কোহিনুর হাতেম তাই' প্রভৃতি। এইসব বই এখনও ছাপা হয়, চাহিদার কারণে। প্রত্যেক বইয়ের শুরুতেই বলা আছে, 'আদি ও আসল'। পুরোনো বিজ্ঞাপনী কায়দা। গওসিয়ার নিজেদের ছাপা মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'ও রয়েছে দেখলাম। তবে

উপরোক্ত বইগুলোর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য দিক, তা হল, বইগুলো ছাপা হয়েছে বাংলায় কিন্তু তার ধাঁচ আরবি লিপির। অর্থাৎ বইগুলো আমাদের সাধারণ পাঠাভ্যাসে পড়া যাবে না। উলটোদিক থেকে পড়তে হবে। এখনও কেন এইভাবে ছাপা হয় জানতে চাইলে আশরাফুল বলেন, 'আসলে এই বইগুলো এইভাবেই ছাপা হয়েছিল, তাই আর নতুন করে করতে ইচ্ছে হয়নি। মনে হয়েছিল, অন্তত কিছু বইয়ের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যটা বজায় থাকুক।'

তবে শুধু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই নয়, গওসিয়া তার 'ঐতিহ্য' ধরে রেখেছে আরও নানাভাবে। যেমন স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই এখানে ছাপা হয় না। অদূর ভবিষ্যতেও যে ছাপার কোনো ইচ্ছে নেই, তাও কথা শুনে স্পষ্টতই বোঝা যায়। অন্যদিকে গল্প-উপন্যাসের বই করতেও তাঁরা উৎসাহী নন। আশরাফুল জানান, '১৯৮০/'৮২ সাল নাগাদ একবার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে কথা হয়েছিল। উনি ওঁর সমস্ত বই আমাদের দেবেনও বলেছিলেন, কিন্তু তারপরে আমিই পিছিয়ে আসি। ভেবে দেখলাম, ওই গল্প-উপন্যাসের পথ আমাদের না।'

কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার অলিতে-গলিতে যখন প্রিন্ট অন ডিমান্ডের হাতছানিতে প্রকাশকেরা মশগুল, সেখানে দাঁড়িয়ে গওসিয়ার বই বিক্রির সংখ্যা কমপক্ষে এক হাজার কপি। সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার। সবচেয়ে বেশি বিক্রি 'কোরান শরীফ'। তাও ইদানীং নানা কারণে তার চাহিদা কিছুটা কমেছে। বিভিন্ন কায়দায় গওসিয়া লাইব্রেরি এই 'কোরান শরীফ' বিক্রি করে। যেমন বিজ্ঞাপনে বলা আছে— ১১ ছত্রি কোরান শরীফ কাপড়ের পপলিন, হাফ ও ফুল চামড়া বাইন্ডিং, ১২৬ নং হাফেজী কোরান শরীফ সাদা পপলিন ও মোমপাতা জ্যাকেট ইত্যাদি। এছাড়া পাওয়া যায় ইসলামিক নানান বই, তাবিজের বই, গজলের বই, জীবনী ইত্যাদি। বেশিরভাগ বইয়ের দামই দু-শো/আড়াইশো টাকার মধ্যে। ছাপাছাপি নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। প্রতিটা বই-ই অত্যন্ত সাদামাটা।

বইমেলার কোনো ব্যস্ততা এই লাইব্রেরিকে স্পর্শ করতে পারেনি। সপ্তাহে রবিবার বাদে বাকি দিন সকাল থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা এই দোকান। ক্রেতাও যে কম আসেন, এমন নয়। গওসিয়ার বই অন্যান্য দোকানদাররা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। বই যায় নানা লাইব্রেরিতেও। নতুন ধরনের বই করার কথা কি একেবারেই ভাবা হয় না? এর উত্তরে আশরাফুল হাসেন, 'নতুন বই তো করেই থাকি, তবে মাথায় রাখি, তা যেন আমাদের ভাবধারার সঙ্গে যায়!'

২০০৭ সাল থেকে পারিবারিক বিবাদের জেরে গওসিয়া লাইব্রেরির মধ্যে ভাগ হয়ে তৈরি হয় জি.কে. প্রকাশনী। এখন গওসিয়ার সমস্ত বইতেই এই জি.কে. প্রকাশনী-র নাম। জি.কে. অর্থাৎ 'গওস' ও 'খাজা'। বেরোবার সময়ে একটা পুস্তক-তালিকা চাই। যা হাতে উঠে আসে, তা আসলে এক ইসলামি পকেট পঞ্জিকা। ওর মধ্যেই গওসিয়ার বইয়ের সাতসতেরো জানানো আছে। উলটে-পালটে দেখতে থাকার সময়ে আশরাফুল শেষ কথাটা বলেন, 'এটা বই নয় বলে তখন আর আলাদা করে বলিনি! এই পঞ্জিকাটারই প্রতি বছর বিক্রি আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি!'

বইপাগলের পান্থশালা

অর্ক দেব

'এসো এসো এ-পান্থশালায়
উপাসনালয়ে যেও নাকো মোটে
ভণ্ড যত ভক্তের দল
মন্দিরে আজ ওরাই জোটে' —দেওয়ান ই হাফিজ

এই দোকানটা পাতালে। পৃথিবীর বুকে চটি খুলে রেখে নেমে যেতে হয়। দরজায় ফিঙ্গার টিপ লক আছে। যিনি প্রথমবার আসছেন তাকে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে। আর যিনি অতীতে এসেছেন, তিনি নির্দিষ্ট বোতামে আঙুল ছোঁয়ালেই দরজা খুলে যাবে। লাল সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় থমকে দাঁড়াতে হতে পারে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে রাখা সারসার বই। দেখার। ছোঁয়া যাবে না। স্রেফ দেখতে হবে। কীটনাশক মাখানো পুরাতনী। পুরোনো ধর্মগ্রন্থ, দেশ-দশের ইতিহাস, ভূগোলের বই। ভ্রামণিকদের আত্মজীবনী। আছে জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস বদলে দেওয়া নানা বইয়ের প্রথম সংস্করণ।

ধাপে ধাপে কিছুটা নামতে নামতেই বাঁ-দিকে একটা দরজা চোখে পড়বে। আগ্রহ থাকলে ঢুঁ মেরে আসতে পারেন। নীল দরজাওয়ালা আলো-আঁধারি ঘরটা একটা ছোটোখাটো ডেটা সেন্টার। এই ঘরে আঠেরোটি আলমারি জুড়ে শুধু ফিল্ম-টেপ রাখা রয়েছে। একেকটি মাইক্রোফিল্ম একেকজন লেখকের আজীবনের কাজের সংকলন। তাঁর পাণ্ডুলিপি, চিঠিচাপাটির প্রতিলিপি। ঘরের এক কোণে রাখা কম্পিউটারে ডিরেক্টরি দেখে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় কোথায় কোন লেখা রাখা। সংখ্যা মিলিয়ে প্লেট বের করে নির্দিষ্ট যন্ত্রের মাধ্যমে চালালেই ভেসে উঠবে কাজ। আমি 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'-র পাণ্ডুলিপি এখানে দেখেছি। দেখেছি জেমস জয়েস। 'ডাবলিনার্স'-এর মার্জিনালিয়া। এমনকী অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের হারিয়ে যাওয়া প্রথম গড়নটিও কে যেন এখানে গুছিয়ে রেখেছে।

আসলে ছাপা অক্ষর থেকে লেখক-পাঠক সম্পর্ক কখনো কখনো ছিটকে বেরিয়ে যায়। তখন পাঠক চায়, লেখককে আরও একধাপ আপন করে পেতে। তাঁর হাতের লেখা, তাঁর ব্যক্তিগত সংলাপ, কণ্ঠস্বর পাঠকমনে এক দীর্ঘ ছায়া ফেলে। ফলে হাতের কাছে এমন একটা সুযোগ পেয়ে অনেকেই হারাতে চান না। ঘুরেফিরে আসেন এই ঘরে। এই ঘরটা সেই কারণেই আসা-যাওয়ার মাঝে একধারে দাঁড়িয়ে।

আমরা আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব। একটা লম্বা ঘরে এসে পড়েছি। এটাই মূল দোকান। আয়তাকার। লাল মোটা কার্পেট পাতা। হলদে মৃদু আলো রাখা জায়গায় জায়গায়। পড়ার জন্য যেটুকু আলো লাগে সেটুকুই। একচুলও উচ্চকিত নয়। ঘরে পিনপতনের শব্দ পাওয়া যাবে, এতই শান্ত। এই ঘরটা অন্তত ২০০ ফুট লম্বা, চওড়ায় ৫০ ফুট। মাঝে একটা পুরোনো মেহগনি কাঠের টেবিল, চেয়ার একটু সরিয়ে রাখা। একসঙ্গে ৫০ জন বসে পড়তে পারবেন। চারপাশে তাকে রাখা সারসার বই। বাংলা, ইংরেজি দু-ভাষার বই-ই রয়েছে। বিষয় অনুসারে তাক ভাগ করা। দুনিয়া কাঁপানো নতুন উপন্যাস। চিন্তার প্রকরণ বদলে ফেলা নিবন্ধ-বই। বিজ্ঞান আর শিল্পকলার তামাম বইপত্র, ক্লাসিক— কী নেই! আমার চোখ চলে গেল টোনি মরিসন সম্পাদিত 'বার্ন দিস বুক' গ্রন্থে। যা কিছু নিষিদ্ধ তাই নিয়ে লিখেছেন সলমন রুশদি, ওরহান পামুক, ইড পার্করা।

আশ্চর্য হয়ে দেখি, এই ঘরের সব ক-টি পিলার ব্যবহৃত হয়েছে কবিতার জন্য। প্রতিটি পিলারের আসলে একটি করে কবিতার বই-বাক্স। সারা পৃথিবীর তামাম কাব্য-অ্যান্থলজি মিলবে এখানে। এই মুহূর্তে হাইতির মেয়েরা কেমন লিখছেন? দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন কবি কারা? ফিদেলের সোনার দিনগুলিতে কিউবার কবিতা কেমন ছিল? গ্রিসে আজ কারা লেখেন? পুতিনের রাশিয়ায় কবিতা কি আজ প্রতিরোধের কথা বলে? একটুকরো প্যালেস্টাইন পাব এই এত দেশের মাঝে? প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে গেলেই হল। উত্তর রাখা আছে অক্ষরে।

বই পছন্দ হলে সময় নিয়ে পড়ুন। ধীরেসুস্থে। নোট নিতে চাইলে, নিন। প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করে ব্যবহারিক কপি রয়েছে। যা কারুর নয়। বা, যা সবার। ফলে, বই দেখলেই কেনার দরকার নেই। সারা দিনমান বসে পড়া যাবে একমনে। কেউ বিরক্ত তো করবেই না বরং বাড়তি তথ্য চাইলে আপনি একজন বিবলিওফিলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ওই এক কোনায় বসে আছেন তিনি। গায়ে ঢোলা কোট, লম্বা চুল-দাড়ি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও বইয়ের হদিশ তাঁর কাছে আছে, আছেই। মাইক্রোফিল্মিং হয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে। প্রাজ্ঞ প্রৌঢ়টি চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে আগে আপনাকে চুল থেকে নখ দেখবেন। প্রশ্ন পছন্দ হলে নির্ঘাৎ চা-কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেবেন। আড্ডায় আড্ডায় চোখের সামনে খুলে যাবে অদীন ভুবন।

চায়ের সঙ্গে 'টা'-এর ব্যবস্থা আছে। এই লম্বা ঘরটার গায়ে তিনটে ঘর রয়েছে। ডানদিকে শৌচালয়। বাঁ-দিকের প্রথম ঘরটা ক্যান্টিন। চা-কফি আসে এখান থেকেই। রয়েছে নানাকিসিমের পুরোনো খাবার। ঠাকুমা-দিদিমাদের আমলের। এসব খাবার কোনোটাই দীর্ঘক্ষণ ধরে খেতে হয় না। হাত ময়লা হয় না। আদ্যিকালের প্যাটি, পাই, চিঁড়ের মোয়া, নারকোল নাড়ু। পড়তে পড়তে মুখ চালানো, এই আর কি। বেরোনোর সময় বইয়ের সঙ্গে খাদ্যমদ্যের দাম দিয়ে দিলেই হল। মদ্য মানে শুধুই বিয়ার। কবোষ্ণ অন্তরটা ঠান্ডা করার জন্য।

এই হলঘরটার শেষদিকে ওই যে একটা চেয়ার রাখা, সপ্তাহে একদিন ওখানে এসে বসেন এক দাস্তানগো। গল্প বলেন। সেই দাস্তানগোর নামপরিচয় জানি না। বংশপরম্পরায় তারা গল্প বলেন। মধ্যপ্রাচ্য, লখনউয়ের রহিস বাড়ির অন্দরমহল ঘুরেছেন ওঁর পিতৃপুরুষ। মহাকাব্য ওদের ঝুলিতে ঘোরে। ওঁর গল্পের কোনো দেশ নেই, কোনো শুরুও নেই, কোনো শেষও নেই। ফি শনিবার সেসব গল্প শুনতে জড়ো হয় নানাদেশের নানালোক। গল্প শুনে যার যা মনে হয় দেন এই দাস্তানগোকে। মাধুকরী সেরে লোকটি পাতাল ছেড়ে পৃথিবীর দিকে রওনা হন। গল্পের খোঁজে।

শুক্কুরবারে এখানে কবিতা পড়েন কোনো এক নবীন কবি। দশ-বিশজন জুটে যায়। নবীনের কবিতা শুনে মত দেওয়া-নেওয়া করেন। উঠে আসে পুরোনো কবিতার কথা। যে যা মনে হয় অর্থ দেন নতুনকে। সেই অর্থেই নতুন কবিদের কাব্যগ্রন্থ ছাপা হয় এই বই-দোকান থেকে। এমন দুশোটি কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ ছেপেছেন ওঁরা। যেহেতু বই ছাপার কোনো খরচ নেই তাই এসব বইয়ের কোনো দামও নেই। কেউ চাইলে স্বেচ্ছায় মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। সেই টাকায় বইটি আবার ছাপা হবে।

হলঘরের শেষদিকে ক্যান্টিন লাগোয়া যে ঘরটি, সেটি রাইটার্স রুম। লেখার ঘর। কখনো কখনো দাস্তানগো বা নবীন কবি দূর থেকে এসে এই ঘরে থেকে যান। তা বাদ দিলে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের লেখার লোক এখানে এসে থাকতে পারেন। আগে বুকিংয়ের ভিত্তিতে এই ঘরটি পাওয়া যায়। যার বেশি অর্থ সে এই ঘর পাবে— এমন চিন্তা এখানে চলবে না। এই ঘরে থাকা-খাওয়ার খরচ নামমাত্র। ছাত্রদের জন্যে ছাড় আছে। গোটা দোকানের যেকোনো বই এখানে আবাসিক হিসেবে থাকার সময় পড়ুয়া পড়তে পারবেন নিখরচায়। এর জন্যে একটা আবেদপত্র পূরণ করতে হবে। সেখানে বিস্তারিত লিখতে হবে, আপনি কী লিখবেন, কেন লিখবেন। আপনার প্রস্তাব পছন্দ হলে এই দোকান থেকে আপনাকে তারিখ পাঠানো হবে। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে ফেললেই হল।

এই বইয়ের দোকানের মালিক কে? আমি জানি না। মনে হয় এখানকার কর্মীরাই মালিক। হয়তো কোনো কোনো নিয়মিত পাঠকেরও অংশীদারিত্ব রয়েছে। এই দোকানটায় আমি বারবার যেতে চাই, নবীন কবির কবিতাবই খুঁজতে। সারাপৃথিবীর খেলার বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে। দাস্তানগোর না-ফুরোনো গল্প শুনতে। বুড়ো বিবলিওফিলের সঙ্গে আড্ডা দিতে। পৃথিবীর কোলাহল পেরিয়ে নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে।

আমার পরের উপন্যাস আমি এখানে বসেই লিখব। আবেদনপত্রটাও সাজিয়ে ফেলেছি। ওরা ফেরাতে পারবে না। এখন শুধু খুঁজতে হবে, দোকানটা কোথায়।

বইমেলার বই

উনসতীদের বেত্তান্ত সতেরো জন যৌনকর্মী/বেশ্যা/রেন্ডি/খানকি-র আত্মকথন, সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন ও সম্পাদনা পারমিতা ব্যানার্জি ও সুমিতা বীথি পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৬৫০ টাকা

আগুন ও প্রজাপতির নকশিকাঁথা রূপায়ণ ভট্টাচার্য ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৫০০ টাকা

দুই বাংলার চায়ের ঠেক ১,২

সম্পাদনা রঞ্জন ভট্টাচার্য, শেখ সাইফুর রহমান, স্মারক রায় চিত্রিত ৬০০ টাকা (প্রতিটি)

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ৪০০ টাকা

নিমাতনামা পঞ্চদশ শতকের ঘিয়াদশাহি সুলতানদের হরেক রন্ধনপ্রণালী, জড়িবুটি ও আতরনামা, ভাষান্তর, টীকা ও ভাষ্য সুপর্ণা দেব সায়নদীপ কংসবনিক চিত্রিত ৪৫০ টাকা

অশ্রুধারাবতী অঞ্জলি দাশ প্রণবেশ মাইতি চিত্রিত ৩০০ টাকা

এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা প্রজ্ঞাদীপা হালদার উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত ৩৭৫ টাকা

নোনাপানি ইশকুল চন্দনা সান্যাল ৪০০ টাকা

শীতলসংহিতা আহার্য আচারবিধির অধ্যাত্মবাদ সোমব্রত সরকার পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৭০০ টাকা

ভুলে যাবার আগে অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তনু মিত্র চিত্রিত (যন্ত্রস্থ)

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে সুকান্ত ঘোষ শুভঙ্কর চক্রবর্তী চিত্রিত (যন্ত্রস্থ)

বাংলার রেস্তোরাঁয় লুপ্তপ্রায় কেবিন সম্পাদনা সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায়, মিলটন ভট্টাচার্য চিত্রিত (যন্ত্রস্থ)

বাঙালির দীপুদা : বাঙালির পুরী সম্পাদনা দময়ন্তী দাশগুপ্ত, সুমেরু মুখোপাধ্যায় ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত (যন্ত্রস্থ)

আমাদের বই

বিরিয়ানির বই
সম্পাদনা সামরান হুদা, দামুখোপাধ্যায়,
স্মারক রায় চিত্রিত ৭০০ টাকা

তোমায় মন দিয়েছি পাহাড় রূপায়ণ ভট্টাচার্য
শিল্প দেবাশীষ দেব, নির্মলেন্দু মন্ডল
অরিন্দম মজুমদার ও পার্থ দাশগুপ্ত, ৩৭৫ টাকা

হারিয়ে যাওয়া গানের খাতা যশোধরা রায়চৌধুরী
সৌরীশ মিত্র চিত্রিত ৬০০ টাকা

পুবালি পিঞ্জিরা সামরান হুদা
পিয়ালী সাধুখাঁ চিত্রিত ৬০০ টাকা

ভোজেরহাটে ভেলভেলেটা,
দামু মুখোপাধ্যায়
স্মারক রায় চিত্রিত ৫০০টাকা

বাঙালির দীপুদা: বাঙালির দীঘা
সম্পাদনা দময়ন্তী দাশগুপ্ত, সুমেরু মুখোপাধ্যায়,
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫০ টাকা

বাঙালির দীপুদা: বাঙালির দার্জিলিং
সম্পাদনা দময়ন্তী দাশগুপ্ত,
সুমেরু মুখোপাধ্যায় ৭০০ টাকা

শহরের উষ্ণতম দিনে জয়জিৎ লাহিড়ী
শুভদীপ ভট্টাচার্য চিত্রিত ৪০০ টাকা

পাতিপুরুষের ফুসমন্তর মণিপুষ্পক সেনগুপ্ত
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত, ৩০০ টাকা

উতল মেঘের পাখিরা মৃণাল শতপথী
প্রবাল চন্দ্র বড়াল চিত্রিত ৩০০ টাকা

মাসান আংরি নিবেদিতা ঘোষ রায়
সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য চিত্রিত ২৫০ টাকা

কুহক যাত্রা
লেখা ও ছবি অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৩৭৫ টাকা

সাগর পারের স্বরলিপি
লেখা ও ছবি রাহুল রায়, ৪০০ টাকা

কবিতার রান্নাঘর কবিদের ঘরবাড়ি

সোমব্রত সরকার পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৫০০ টাকা

আহমান প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত, ৫০০ টাকা

ফুডপ্যাথি (স্ট্রিট ফুড সংকলন) ১-৬
সম্পাদনা সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায়
স্মারক রায় চিত্রিত ৫০০ টাকা (প্রতিটি)

ফুডপ্যাথি ১, ২
সারা পৃথিবীর পথের খাবার এক, দুই

আমাদের বই

ফুডপ্যাথি ৩,৪
ভারত জোড়া পথের খাবার এক, দুই

ফুডপ্যাথি ৫,৬
দুই বাংলার পথের খাবার এক, দুই

মেলোডি জংশন শিবাংশু দে
শিল্প পার্থ দাশগুপ্ত ৮০০ টাকা

মারাদোনা কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৫০০ টাকা

গোস্তখোর উপমন্যু চ্যাটার্জি
ভাষান্তর অচিন্ত্যরূপ রায় ২৫০ টাকা

আমার বস্তি-জীবন অহনা বিশ্বাস
অনুষ্কা দত্ত চিত্রিত ২৫০ টাকা

সুরক্ষাশমিতা (নারীসুরক্ষা বিষয়ক সংকলন)
সম্পাদনা স্বাতী রায় ঐন্দ্রিলা বসাক চিত্রিত ৩৫০ টাকা

অবহু অপরাজিতা অ্যাসিড আক্রান্তদের কথা সংকলন
সম্পাদনা রোহিনী ধর্মপাল নীলা কে চিত্রিত ৩০০ টাকা

বাঙালির বাই সাইকেল সংকলন,
সম্পাদনা সামরান হুদা অত্রি চেতন চিত্রিত ৬০০ টাকা

বাঙালির মৎস্যশিকার গদ্যসংগ্রহ
সম্পাদনা বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়
দীপ্তীশ ঘোষ দস্তিদার চিত্রিত ৬০০ টাকা

রসনার রুটম্যাপ অরুণাভ দাস
উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত ৬০০ টাকা

ভজন ভোজনে বাঙালির শ্মশান সোমব্রত সরকার
পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৬০০ টাকা

পথ ঢেকে যায় নকশি কাঁথায় পৃষতী রায়চৌধুরী
শুভঙ্কর চক্রবর্তী চিত্রিত ৩০০ টাকা

দাস্তান এ দাওয়াখানা সব্যসাচী সেনগুপ্ত
শুভদীপ ভট্টাচার্য চিত্রিত ৫০০ টাকা

বাংলার বুলবুল আঙ্গুরবালা
প্রশান্ত দাঁ ৩০০ টাকা

জাহাজের জলতরঙ্গ
মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫০ টাকা

শঙ্কু অভিযান প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত
সত্যজিৎ রায় চিত্রিত ৪০০ টাকা

স্বাদ-সাধনার আখড়াবাড়ি সোমব্রত সরকার
পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৪৫০ টাকা

রসুইবাগান জায়েদ ফরিদ
বাসুদেব পাল মজুমদার চিত্রিত ৪০০ টাকা

ভালবাসি তাই জানাই গানে অরুণেন্দু দাস
এ এফ এম মনিরুজ্জমান শিপু চিত্রিত ৬০০ টাকা

দুই বাংলার পাইস হোটেল
সম্পাদনা সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায়
স্মারক রায় চিত্রিত ২য় সংস্করণ ৫০০ টাকা

বাজার ভ্রমণ
সম্পাদনা সামরান হুদা, সুমেরু মুখোপাধ্যায়
উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত ৪৫০ টাকা

লেডিজ টয়লেট (সুলভ সংস্করণ)
সম্পাদনা শ্রাবন্তী ঘোষ ৩০০ টাকা

খাদের ধারে ঘর গার্হস্থ্য হিংসার গতিবিধি
(সুলভ সংস্করণ) সম্পাদনা শতাব্দী দাশ
তৈয়বা বেগম লিপি চিত্রিত ৪০০ টাকা

সন্দীপন সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি
সম্পাদনা অদ্রীশ বিশ্বাস, প্রবীর চক্রবর্তী
হিরণ মিত্র চিত্রিত ৫৫০ টাকা

তৃণ রতন ভট্টাচার্য
ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৬০০ টাকা

মাটির তেলের আলো
লেখা ও ছবি অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৪৫০ টাকা

অন্তর্ধানে অনুসন্ধানে
সঞ্জয়ের আসাম সঞ্জয় ঘোষের ডায়েরি ও অন্যান্য লেখা
সংকলন ও সংযোজন সুমিতা ঘোষ
ভাষান্তর মনোতোষ চক্রবর্তী ৩৫০ টাকা

পদদেশে নেই জন্মভূমি
লেখা ও ছবি অদ্রীশ বিশ্বাস ৩০০ টাকা

বনবাসে বন আবাসে ১, ২
জগন্নাথ ঘোষ হিরণ মিত্র চিত্রিত ৫০০ টাকা (প্রতিটি)

আশমান জমিন সেলিম মল্লিক
শুভঙ্কর চক্রবর্তী চিত্রিত ২৫০ টাকা

দিগন্তদীঘির সীমা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণবেশ মাইতি চিত্রিত ২৫০ টাকা

বিরল পাতার গাছ মৃণাল শতপথী
সুভাষ ভ্যাম চিত্রিত ২৫০ টাকা

সাকিন সুতানুটি গগন চক্রবর্তী
ডেসমন্ড ডয়েগ চিত্রিত ২৫০ টাকা

তিন ছক্কা পুট সব্যসাচী সেনগুপ্ত
শুভদীপ ভট্টাচার্য চিত্রিত ৩৫০ টাকা

আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী প্রজ্ঞাদীপা হালদার
বাবলি পাল চিত্রিত ৩০০ টাকা

মজিদ কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৪০০ টাকা

ফেলুদা রহস্য প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত
সত্যজিৎ রায় চিত্রিত ৫০০ টাকা

আমাদের বই

পাহাড়ে আহারে দামু মুখোপাধ্যায়
স্মারক রায় চিত্রিত ৫০০ টাকা

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার
শিল্প সত্যজিৎ রায়, যুধাজিৎ সেনগুপ্ত ৬০০টাকা

গড়গড়ার মা'লো পূর্ণা চৌধুরী
পার্থ দাশগুপ্ত চিত্রিত ৫০০ টাকা

গদ্যসংগ্রহ ১, ২ রণজিৎ সিংহ
সম্পাদনা শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
খালেদ চৌধুরী চিত্রিত
৬০০ টাকা (প্রতিটি)

এক জীবন সুন্দরবন অভিজিৎ সেনগুপ্ত
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ৫০০ টাকা

খেয়া পারের খেয়ালি বন সীমা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণবেশ মাইতি চিত্রিত ৩৫০টাকা

রিনুর বই রিনি বিশ্বাস
ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৩৫০টাকা

দস্তরখান গোরা রায়
স্মারক রায় চিত্রিত ৩৫০ টাকা

দশকর্ম ভাণ্ডার যোষিতা
দেবারতি শেঠ চিত্রিত ৪০০ টাকা

দ্রোহকালের দামিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা
সংগ্রহ ও আলোকচিত্র কার্লোস সাভেদ্রা
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঝর্ণা বসু
আবদুস শাকুর শাহ চিত্রিত ৪০০ টাকা

একদা একাত্তর দুঃখ সুখের ঝাঁপি
সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্ত
সোমা সুরভি জান্নাত চিত্রিত ৩৫০ টাকা

এসেছিলে তবু এষণায় লিপিকা দে
মল্লিকা দাস সুতার চিত্রিত ৩৫০ টাকা

আটঘাট বেঁধে
লেখা ও ছবি শঙ্খ কর ভৌমিক ২৫০ টাকা

লীলাবতী অদ্রীশ বিশ্বাস
শিল্প হিরণ মিত্র ২য় মুদ্রণ ২৫০ টাকা

জঙ্গলগাথা ও রসনাবিলাস
ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
শর্মিষ্ঠা বসু চিত্রিত ২য় সংস্করণ ৬০০ টাকা

অজানা উড়ন্ত বই
রঞ্জন ঘোষাল-এর রম্য প্রবন্ধ সংকলন ৬০০ টাকা

কালচক্রযান মিহির সেনগুপ্ত
সৌমিক চক্রবর্তী চিত্রিত ৩৫০ টাকা

ঝরা সময়ের কথকতা
হিরণ মিত্র ১০০০ টাকা

কবিতা লিখতে ভয় করে বিপুল দাস
অরিন্দম মান্না চিত্রিত ৩৫০ টাকা

টুকিটাকী কুজ্ঝটিকা সীমা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণবেশ মাইতি চিত্রিত, ২য় মুদ্রণ ৩৫০ টাকা

আপন বাপন জীবন যাপন সম্বিৎ বসু
ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৩২৫ টাকা

এলাটিং বেলাটিং ১, ২
সম্পাদনা অরণি বসু, সামরান হুদা,
বালিকাবেলা সংকলন ৫০০ টাকা (প্রতিটি)

ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা
সম্পাদনা ঝর্ণা বসু
আলোকচিত্র কিশোর পারেখ ২য় মুদ্রণ ৪৫০ টাকা

জীবন-মৃত্যু ১, ২ অসীম রায়
সম্পাদনা রবিশংকর বল্, কুশল রায়
৬০০ টাকা (প্রতিটি)

কামলাসুন্দরী কর্মরতা মহিলাদের কথা সংকলন
সম্পাদনা জয়িতা বাগচি
সুমেরু মুখোপাধ্যায় ৭৫০ টাকা

রসনাস্মৃতির বাসনাদেশ ১, ২
সম্পাদনা সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায়,
স্মারক রায় চিত্রিত ৬০০ টাকা (প্রতিটি)

উচ্ছন্নে যাওয়ার রাস্তায় সৌমিত দেব
শিল্প তারকাটা লেফ, ঋতবান দাস, পার্থ দাশগুপ্ত
৩৫০ টাকা

লটন মটন পায়রাগুলি সুচেতনা দত্ত
উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত ২য় সংস্করণ ৩২৫ টাকা

গোল্লাছুট কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৬০০ টাকা

অতঃপর অন্তঃপুরে সামরান হুদা
চন্দন শফিকুল কবীর চিত্রিত ৫০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)

আইটি আইটি পা পা যোষিতা ৪৫০ টাকা

খ্যাটন সঙ্গী দামু মুখোপাধ্যায়
স্মারক রায় চিত্রিত ৩য় সংস্করণ ৬০০ টাকা

স্বাদ সঞ্চয়িতা সামরান হুদা
মাহ্‌বুবুর রহমান চিত্রিত ২য় সংস্করণ ৬০০ টাকা

পাখালিনামা রূপঙ্কর সরকার ৫৫০ টাকা

রমণীয় দ্রোহকাল রঞ্জন রায় ৪০০ টাকা

সুরের গুরু আলাউদ্দিন শোভনা সেন
সম্পাদনা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫ টাকা

সাত ঘাটের জল শঙ্খ কর ভৌমিক
মৃন্ময় দেববর্মা চিত্রিত ২৫০ টাকা

করোনাকালীন বিশেষ প্রকল্প

হেঁসেলনামা সেট ১৯৫০.০০

নতুন গোয়েন্দা/রহস্য গল্প সেট ১৮৬০.০০

ভয়াল ভয়ঙ্কর

নরবলি আজও ঘটে অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ২০০ টাকা

হেঁশেলনামা

রান্নাঘরের নক্‌শি খাতা চন্দনা সান্যাল ১৮০ টাকা
রন্ধনরণরঙ্গশালা লিপিকা দে ২০০ টাকা
রাগ রসোই সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ২২০ টাকা
কলকাতার হেঁশেল-রূপ ও রূপান্তর সোমা মুখোপাধ্যায় ২২০ টাকা
অমৃতের সন্ধানে রাজা সিংহ ১৮০ টাকা
কিচেন মারাঠেওয়াড়া অর্পিতা ভট্টাচার্য ২০০ টাকা
পরবাসের হেঁশেলে মৃদুলা মুখোপাধ্যায় ১৬০ টাকা
ইন্দুর হেঁশেলনামা ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় দাস ২২০ টাকা
কথা ও কাহিনির রান্নাঘর সুমি দত্তগুপ্ত ১৭০ টাকা
খাইবার পাস তুষ্টি ভট্টাচার্য ২০০ টাকা

জার্নাল ১

লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা ১৮০ টাকা

জার্নাল ২

লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা ১৬০ টাকা

জার্নাল ৩

লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা ১৬০ টাকা

মুক্ত করো ভয়

মেয়েদের উনিশ-কুড়ি শতকের পথ চলা
সম্পাদনা গোপাদত্ত ভৌমিক সংকলন ৫০০ টাকা

নতুন গোয়েন্দা/রহস্য গল্প

খুড়োদার হাতেখড়ি অয়ন চট্টোপাধ্যায় ১৮০ টাকা
গাছেরা ও কয়েকটি রহস্য মালিনী মুখার্জি ১৭০ টাকা
একুশের বিষে অর্ণব ঘোষাল ১৭০ টাকা
চাঁদের সিঁড়ি সব্যসাচী সেনগুপ্ত ২০০ টাকা
কালসর্প অরিন্দম মজুমদার ২০০ টাকা
নষ্ট জীবন সুপ্রিয় সেনগুপ্ত ১৫০ টাকা
আর্য স্যর এবং সায়নী ঘোষ ১৮০ টাকা
ফ্রেডরিক্সনগরের ফিরিঙ্গি অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ২০০ টাকা
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত শ্রীজিৎ সরকার ২০০ টাকা
বিষ কুয়াশা অবিন সেন ২২০ টাকা

৯ঋকাল মুখপত্র

চমৎকার ১ প্রচ্ছদকাহিনি

৯ঋকাল বুকসের মুখপত্র ২০১৭ ৩০ টাকা

চমৎকার ২ হরফনামা

৯ঋকাল বুকসের মুখপত্র ২০১৮ ৩০ টাকা

চমৎকার ৩ অভিধান হেতু

৯ঋকাল বুকসের মুখপত্র ২০১৯ ৩০ টাকা

চমৎকার ৪ প্রুফ রিডিং

৯ঋকাল বুকসের মুখপত্র ২০২০ ৩০ টাকা

চমৎকার ৫ উৎসর্গের সাতকাহান

৯ঋকাল বুকসের মুখপত্র ২০২২ ৫০ টাকা

চমৎকার ৬ বই পড়া

৯ঋকাল বুকসের মুখপত্র ২০২৩ ৫০ টাকা

পুরস্কার প্রাপ্ত বই

নমিতা চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৫

অতঃপর অন্তঃপুরে সামরান হুদা, চন্দন শফিকুল কবীর চিত্রিত ৪৫০ টাকা

বইচই আন্তর্জাতিক আন্তর্জাল সেরা সাহিত্য সম্মান, ২০১৮

আইটি আইটি পা পা, যোষিতা, ৪৫০ টাকা

মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার, ২০২৩

আশমান জমিন, সেলিম মল্লিক, শুভঙ্কর চক্রবর্তী চিত্রিত ২৫০ টাকা

সব বই বই নয়, কিছু কিছু বই

কলকাতা বইমেলা

স্টল নম্বর ৫১৪

বইমেলা প্রাঙ্গণ, সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক

৬ বা ৭ নং গেট দিয়ে ঢুকে পশ্চিমবঙ্গ স্টলের পিছনে

সারা বছর আমাদের বই পাওয়া যায় কলেজস্ট্রিটের দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপুদার দোকান), আদি দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, লালন বুক শপ, বই বর্ণমহল (লালমাটি), সুপ্রকাশ বইঘর, ধ্যানবিন্দু, খোয়াবনামা, উল্টোডাঙার সুনীলদার দোকান, শ্রীরামপুর ভেস্ট পকেট বুক শপে, চুঁচুড়ার বিদ্যার্থী ভবন, মালদার পুনশ্চতে। বাংলাদেশে পাবেন প্রথমা, বাতিঘর, পাঠক সমাবেশ, বিদিত, বইভূত ঢাকা ও তক্ষশিলায়। দেশ ও দেশের বাইরে বাড়ি বসে বই পেতে দে বুক অন লাইন, বই পড়বই (প্রতিক্ষণ), বইচই ডট কম, বুক হপার্স, ভেস্ট পকেট, হারিত বুকস, মেঘ বুকস, বইপোকা, বইভূত, মেঘ বুকস, ওপারের বই, থিংকারস লেন, ধ্যানবিন্দু এবং দেশের মধ্যে অ্যামাজন ডট ইন, ফ্লিপকার্ট বা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন WA ৯৭৪৮৭৪৭৪৮৭ নম্বরে।

পাণ্ডুলিপি পাঠাতে ও নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে দেখুন

www.lyriqalbooks.com

আগামী প্রকাশনা

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ১, ২ সম্পাদনা শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিপটে বঙ্গজীবন ও কলকাতা ১, ২ (সংকলন) সম্পাদনা দেবাশিস বসু

প্রাচীন চন্দননগরের বারাঙ্গনা ও নেশা কলোনির আশ্চর্য জগৎ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনাসমগ্র ১, ২ অরূপরতন বসু সম্পাদনা শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

গদ্যসমগ্র ১, ২, ৩ প্রতাপকুমার রায় সম্পাদনা সুমেরু মুখোপাধ্যায় ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত

মাইহার ব্যান্ড: আলাউদ্দিন খাঁ ও পরম্পরা কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ব্যান্ডনামা অনির্বাণ ভট্টাচার্য

মেলোডি ইস্টিশন শিবাংশু দে

রসনাদেশ পূর্ববঙ্গের খাওয়াদাওয়ার স্মৃতি প্রণবরঞ্জন রায়

ভোজন মানচিত্রে বাংলাদেশ সুমনকুমার দাশ

ভোজনে বিজ্ঞাপনে বাঙালি প্রণবেশ মাইতি

পাকদর্পণ সংস্কৃতে লেখা আদি রসনাসূত্র টীকা ও ভাষ্য বিজয়া গোস্বামী

ব্যঞ্জন বর্ণপরিচয় সামরান হুদা

সন্নিকটে উত্তরকুরুবর্ষ লাদাখ বিমার্গনুসরণে অবিধেয় চরিতনামা লেখা ও ছবি অনিত্য রায়